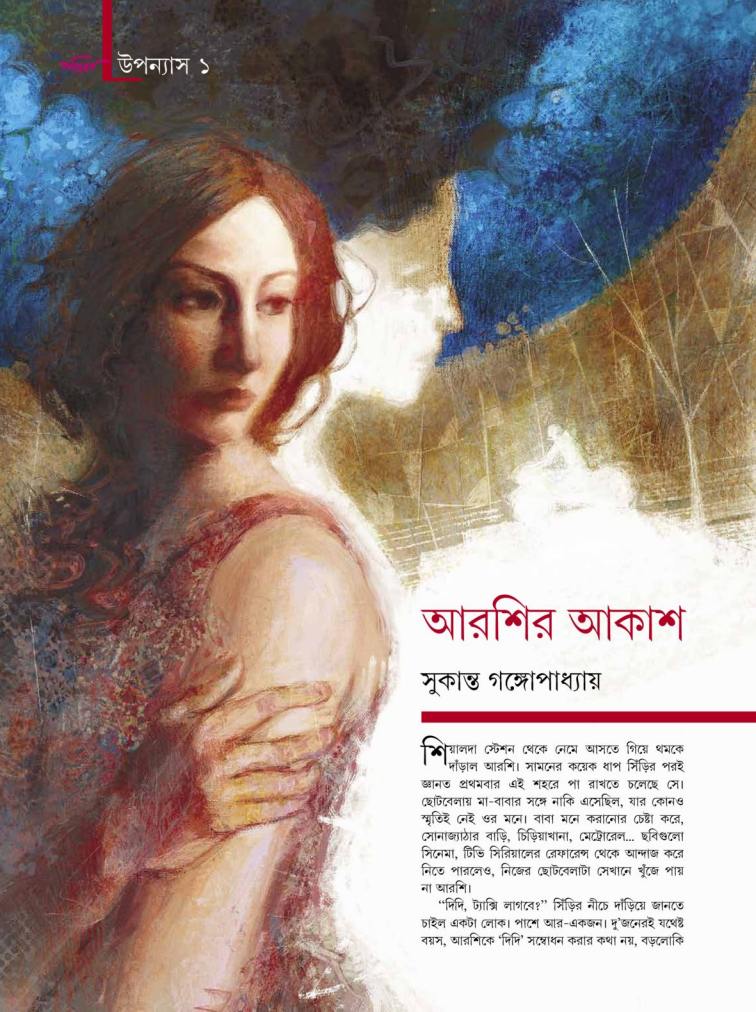

আরশির আকাশ

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

শিয়ালদা স্টেশন থেকে নেমে আসতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল আরশি। সামনের কয়েক ধাপ সিঁড়ির পরই জ্ঞানত প্রথমবার এই শহরে পা রাখতে চলেছে সে। ছোটবেলায় মা-বাবার সঙ্গে নাকি এসেছিল, যার কোনও স্মৃতিই নেই ওর মনে। বাবা মনে করানোর চেষ্টা করে, সোনাজ্যাঠার বাড়ি, চিড়িয়াখানা, মেট্রোরেল... ছবিগুলো সিনেমা, টিভি সিরিয়ালের রেফারেন্স থেকে আন্দাজ করে নিতে পারলেও, নিজের ছোটবেলাটা সেখানে খুঁজে পায় না আরশি।

"দিদি, ট্যাক্সি লাগবে?" সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে জানতে চাইল একটা লোক। পাশে আর-একজন। দু'জনেরই যথেষ্ট বয়স, আরশিকে 'দিদি' সম্বোধন করার কথা নয়, বড়লোকি

চেহারার জন্যই করল। মাথা নেড়ে ট্যাক্সির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আরশি নেমে এল নীচে। নাক বরাবর হাঁটতে থাকে। পিঠে ঢাউস রুকস্যাক, ট্যাক্সি তাকে নিতেই হবে। তার আগে ঠিক করতে হবে আপাতত যাবে কোথায়।

দুপুর দুটোয় গোলপার্কে যাওয়ার কথা আরশির। এখন সকাল আটটা। ট্রেন যদি লেট না করত, আরও আধঘন্টা আগে পৌঁছে যেত শিয়ালদায়। এখানে তাকে রিসিভ করার কথা ছিল পূর্বার। আগামী সাতদিন ওদের বাড়িতেই থাকা ঠিক হয়েছিল। ফেরার ট্রেন ধরত ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে শিয়ালদায় এসে। সেই মতো রিজার্ভেশন করা আছে টিকিট। আজ ভোরে ফোন এল পূর্বার! রিংয়ের আওয়াজ ঘুম ভেঙেছিল আরশির। বার্থে শুয়ে ফোন ধরেছিল সে। ট্রেনের দুলুনি আর তন্দ্রাভাব উপভোগ করতে-করতে ভড়ানো গলায় বলেছিল, "ঠিক আছি রে বাবা। ঘুমোচ্ছি। এখনও কিডন্যাপ্‌ড হইনি।"

গতকাল ট্রেনে ওঠার পর থেকে বারছয়েক ফোন করে সতর্ক করেছে পূর্বা, "পার্স, মোবাইল সব সময় সঙ্গে রাখবি। ট্যরেলে যাবি ট্রেন রানিং অবস্থায়। কেউ যেচে পড়ে আলাপ করতে এলে পাত্তা দিবি না...।" এরকম আরও অনেক কিছু। কিন্তু ভোরের ফোনটা একেবারেই ওই গোত্রের ছিল না। ভীষণ উৎকণ্ঠায় পূর্বা বলে উঠেছিল, "বিরাট বিপদ হয়ে গিয়েছে রে বাড়িতে! মাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে নার্সিংহোমে। হাউস ফিজিশিয়ান বলছে, কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট। তুই দু'-চারটে দিন অন্য কোথাও থাকার ব্যবস্থা কর। তোর কোনও রিলেটিভের বাড়িতে। মায়ের ব্যাপারটা কন্ট্রোলে এলেই তোকে ডেকে নেব।"

উত্তরে কী বলেছিল, এখন আর মনে নেই আরশির। অদ্ভুত একটা ঘোর-লাগা অনুভূতি। মনে হচ্ছিল, সে পড়ে রইল স্থির, ট্রেনটা তাকে ছেড়ে ছুটে যাচ্ছে। আপার বাঙ্কে তার বার্থ। উঠে বসেছিল আরশি। কান দুটো গরম হয়ে গিয়েছে। ধড়াসধড়াস করছে বুক। কলকাতার কিচ্ছু সে চেনে না। এখানকার কোনও আত্মীয়র সঙ্গে তাদের যোগাযোগ নেই। আরশির ফেসবুকের কিছু বন্ধু অবশ্য আছে। কিন্তু তাদের তো হঠাৎ মেসেজ করে বলা যায় না, তোমার বাড়িতে থাকতে আসছি। ভার্চুয়াল ফ্রেন্ডের উপর অতটা দাবি খাটানো যায় না। তা হলে কি শিয়ালদায় নেমেই বাড়ি ফেরার বন্দোবস্ত করবে? ট্রেনের রিজার্ভেশন পাওয়া যাবে না কিছুতেই। উইদাউট রিজার্ভেশনে জেনারেল কামরায় জলপাইগুড়ি অবধি যাওয়া প্রায় অসম্ভব। হাতে রইল ভলভো বাস। ধর্মতলা থেকে ছাড়ে সন্ধেরাতে। আরশি জানে না ধর্মতলা কোথায়। সে না হয় লোককে জিজ্ঞেস করে পৌঁছে যাবে। কিন্তু সেখানেও যদি সিট না পাওয়া যায়, রাতটা কোথায় কাটাবে আরশি? এসি কামরায় বসে ঘামছিল সে। এই সব ঝঞ্ঝাট থেকে বাঁচতে গেলে আরশির অবশ্যই যেটা করা উচিত, তা হল বাবাকে একটা ফোন। আর কিছু ভাবতে হবে না। বাবা আজই তার জলপাইগুড়ি ফেরার বন্দোবস্ত করে ফেলবে। অথবা আরশি যদি বলে আমি কলকাতার কাজ সেরেই ফিরব, বাবা জলপাইগুড়িতে বসেই তারও ব্যবস্থা করবে অনায়াসে। সে ক্ষেত্রে একটা সমস্যা হচ্ছে, বাবা যেখানে, মানে যাদের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করবে, তারা আরশির ব্যাপারে এতটাই খেয়াল রাখবে, কলকাতায় আসার মূল উদ্দেশ্যটা পণ্ড হবে। বাবা আসল উদ্দেশ্যটা জানে না। আরশি অন্য অজুহাত দিয়ে কলকাতায় এসেছে। বলেছে মাস কমিউনিকেশন নিয়ে কোথায় ভাল পড়ানো হয়, অ্যাডমিশন অনার্সের নাম্বার দেখে হয়, নাকি পরীক্ষা দিতে হবে, সব ভাল করে বুঝে আসতে চায়। কলকাতায় গিয়ে থাকবে পূর্বাদের বাড়িতে।

গোটা পরিকল্পনাটায় আপত্তি করেনি বাবা। খানিক দ্বিধা নিয়ে একবার শুধু বলেছিল, "আমি গিয়ে দিয়ে আসি পূর্বাদের বাড়ি? ফেরার দিন নিয়ে আসব।"

"কোনও দরকার নেই। অনার্সের ফাইনাল ইয়ার কমপ্লিট হয়েছে আমার, এখন আমি আর ছোট্টটি নই। পূর্বা আমাকে স্টেশন থেকে রিসিভ করবে, ফেরার দিন সি অফও করতে আসবে। শুধু ট্রেনজার্নিটুকু একা। পূর্বা তো হায়ার সেকেন্ডারির পর থেকেই একা যাতায়াত করত এই রুটে," বলেছিল আরশি।

বাবা আর কোনও আপত্তি করেনি। পূর্বার মা-বাবার সঙ্গে আরশির কলকাতায় থাকার ব্যাপারে কথা বলে নিয়েছিল। পূর্বার সঙ্গেও কথা হয়েছে বাবার। কাল যখন আরশিকে ট্রেনে তুলে দিতে এসেছিল বাবা, তখনও একবার পূর্বাকে ফোন করে জেনেছে। সে শিওর আসছে, নাকি আরশি ট্যাক্সি নিয়ে ওদের বাড়িতে যাবে?

'আসছি' বলে আশ্বস্ত করেছিল পূর্বা। তখন তো আর জানত না পরিস্থিতি এভাবে বদলে যাবে। পূর্বার কারণেই এত নিশ্চিন্ত মনে আরশিকে ছেড়েছে বাবা। জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে চার বছর পড়েছে পূর্বা। লাস্ট দু'বছর আরশিদের বাড়ির পেয়িংগেস্ট ছিল। ফাঁকায় লেখাপড়া করতে পারবে বলে। পূর্বা আরশিদের বাড়ির লোকই হয়ে গিয়েছিল প্রায়। ওর বাবা-মাও মাঝে-মাঝে এসে থাকত। পূর্বারা আরশিদের কাছে আত্মীয়র চেয়ে কিছু কম নয়। পূর্বার মায়ের হার্ট অ্যাটাকটাই সমস্ত ব্যবস্থাটা ওলটপালট করে দিল। কাকিমার অসুস্থতার কথা শুনে মনখারাপ করছিল আরশির, তবে তেমন জোরালো কিছু নয়। এই মুহূর্তে নিজের কলকাতায় থাকা নিয়ে বেশি চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। বাবাকে ফোন করে ফিরে সে যেতেই পারে। কিন্তু যে লক্ষ্য নিয়ে চলেছে কলকাতায়, সেটা এবার হাতছাড়া হলে আর কখনও সুযোগ নাও আসতে পারে। চিন্তায় মাথা জট পাকিয়ে গিয়েছিল আরশির। বাঙ্ক থেকে নেমে ট্রেনের টয়লেটে যায়। ঘাড়ে-মুখে জল দিয়ে যখন ফিরে এল, ছুটন্ত ট্রেনের কাচের জানলার বাইরে তখন ভোর ফুটছে।

ওই আলোই যেন একটু সাহস জুগিয়েছিল আরশিকে। মনে হয়েছিল কলকাতায় ঘণ্ডাখানেক ঘুরে দেখি না, কোথাও নিরাপদ কোনও থাকার ব্যবস্থা করা যায় কি না। না পেলে, বাবাকে সমস্যার কথা জানাবে। ভাবনা থামিয়ে ফের চাদর টেনে ঘুমের কোলে মাথা রেখেছিল আরশি। ট্রেনের দুলুনির ঘুম ভীষণ এনজয় করে আরশি। তার উপর এবার সে একা! এর মজাই আলাদা।

আবারও ঘুম ভেঙেছিল ফোনের রিংটোনের আওয়াজ। বাবার কল। জিজ্ঞেস করেছিল, "পৌঁছলি?"

ট্রেনের অ্যারাইভাল টাইম ধরে ফোন করেছিল বাবা। আরশি একেবারে স্বাভাবিক গলায় বলেছিল, "না, পৌঁছয়নি এখনও। লেট রান করছে।"

"কত লেট?" জানতে চেয়েছিল বাবা।

আরশি বলেছিল, "খুব বেশি নয় মনে হয়। তেমন দেরি হলে কো-প্যাসেঞ্জাররা নিশ্চয়ই বলাবলি করত। তুমি চিন্তা কোরো না, ট্রেন থেকে নেমেই ফোন করে দেব।"

সেই ফোন এখনও করা হয়নি। স্টেশন চত্বর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে আরশি। সামনে ওয়ানওয়ে রাস্তা। কলকাতার ভিড় সম্বন্ধে যা শুনেছিল, এখন তেমনটা দেখছে না। গাড়ির জ্যাম

নেই, লোক চলাচল স্বাভাবিক। কাঁধের ভারী ব্যাগটার জন্য একটু ঝুঁকে গিয়েছে আরশি, স্টেশনে ঢোকার রাস্তা ছেড়ে উঠে পড়ে ফুটপাথে। লাগোয়া ওয়ানওয়ে রাস্তাটা গিয়েছে বাঁদিকে, ওপারেরটা ডান দিকে। গোলপার্কটা কোন দিকে? কাজটা যেহেতু ওইখানেই, ওখানকার কাছাকাছি কোনও হোটেলে থাকাই উচিত হবে। শুধু একটাই চিন্তার বিষয়, একুশ বছরের একটি মেয়েকে কি একা থাকতে দেবে কোনও হোটেল? ডান-বাঁয়ে তাকিয়ে এক ভদ্রলোককে বেছে নেয় আরশি, উনি কাছাকাছি এসে পড়তেই জিজ্ঞেস করে, ''স্যার, গোলপার্ক যাব। কোথায় দাঁড়াব ট্যাক্সির জন্য?''

আরশিকে আপদমস্তক দেখে নিয়ে লোকটা বলল, ''ওপারের রাস্তায় চলে যাও। ট্যাক্সি যদি রিফিউজ় করে ক্রসিংয়ে দাঁড়ানো ট্রাফিক পুলিশকে বলবে। ওরাই অ্যারেঞ্জ করে দেবে ট্যাক্সি।''

''থ্যাঙ্ক ইউ,'' বলে সৌজন্যের হাসি হাসল আরশি। হাসি বিনিময় করে এগিয়ে গেল লোকটা। সিগনাল না পেয়ে সমস্ত গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে। আরশি রাস্তা পার হয়। ওপারে পৌঁছে একটা হলুদ ট্যাক্সিকে হাত দেখাতেই দাঁড়িয়ে পড়ল। ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, ''কোথায়?''

আরশি গম্ভব্য বলে। ড্রাইভার বলল, ''উঠে পড়ুন।''

এখনও অবধি ঠিকঠাক আছে সব কিছু। শহরের মানুষগুলো বেশ কো-অপারেট করছে। এরপর কী হয় দেখা যাক! কলকাতার বদনাম তো কিছু কম নয়। কাঁধের ব্যাগ পাশে রেখে সিটে হেলান দিয়েছে আরশি। ট্যাক্সির ড্রাইভারের চেহারাটা ভদ্রসভ্য। এর থেকে কি গোলপার্ক সংলগ্ন কোনও ভাল হোটেলের রেফারেন্স চাওয়া যায়? 'ভাল' বলতে হাইফাই কিছু নয়। মধ্যবিত্তের জন্য নির্ভরযোগ্য হোটেল। আরশির সঙ্গে খুব বেশি টাকা নেই। হোটেলে থাকতে হতে পারে, দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি। ডেবিট কার্ড অবশ্য আছে। অ্যাকাউন্ট তেমন হেলদি নয়। লাগে না তো বড় একটা। দামি হোটেলে থাকতে হলে বাবাকে বলতে হবে অ্যাকাউন্টে টাকা ফেলতে। বাবা জানতে চাইবে, হঠাৎ টাকার দরকার পড়ছে কেন? সত্যিটা বললে বাবা কিছুতেই একা হোটেলে থাকতে দেবে না। আর মিথ্যে বললে গিয়ে এত কথা বানাতে হবে, পরে হয়তো নিজেরই সব মনে থাকবে না। অর্থাৎ নিজের ভাঁড়ারে যেটুকু টাকা আছে, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাছতে হবে হোটেল।

ইতিমধ্যে তিনটে ক্রসিং পার হল ট্যাক্সি। কোনওটাতেই বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হয়নি। এখন রাস্তা বেশ ফাঁকা, পিপ্‌ড তুলেছে ড্রাইভার। আরশি জিজ্ঞেস করে, ''আচ্ছা দাদা, গোল পার্কে মাঝারি ভদ্রস্থ কোনও হোটেল...''

কথা শেষ করতে পারে না আরশি, ফোন বাজছে তার। মনে হচ্ছে বাবার ফোন। আরশিরই করার কথা ছিল, ভুলে মেরে দিয়েছে। জিন্‌স্ থেকে ফোনসেট বার করল আরশি, ঠিক তাই। বাবার কল। কানে ফোন নিয়ে আরশি বলল, ''হ্যাঁ, বাবা। নেমে পড়েছি। ট্যাক্সিতে আছি এখন।''

''পুর্বা এসেছে নিতে?'' ও প্রান্ত থেকে জানতে চাইল বাবা।

আরশি বলল, ''হ্যাঁ, আমার পাশেই বসে আছে। কথা বলবে? না, দাঁড়াও পরে কথা বোলো। ফোনে কাউকে কোনও মেসেজ পাঠাচ্ছে দেখছি।''

''ওকে, পরে কথা হবে। ওদের বাড়ি পৌঁছে সময় করে একবার ফোন করিস। রাখছি।''

ফোন কাটল বাবা। আরশির এই মুহূর্তে ভীষণ টেনশন হচ্ছে। এত বড় মিথ্যে বলার জন্য নয়, মিথ্যেটা যখন বলছে, ড্রাইভার ঘাড় ঘুরিয়ে কড়া চোখে তাকিয়েছিল। ভেবেছে মেয়েটার নিশ্চয়ই কোনও বদ মতলব আছে। সঙ্গে কেউ নেই অথচ বাবাকে বলছে পাশে বসে আছে একজন। ড্রাইভারের যা এক্সপ্রেশন দেখল আরশি, হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে না বলে ওঠে, 'নেমে যান।'

● ২ ●

সাধারণত এত স্পিডে বাইক চালায় না শৌর্য। ফাঁকা হাইওয়ে পেলে বড় জোর ষাট। এখন চালাচ্ছে একশোর উপর। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কলকাতায় ফিরতে হবে। বিকেলের দিকে একটা অ্যানাইনমেন্ট আছে। পিঠোপিঠি দিনে দুটো কাজ নেওয়া ঠিক হয়নি। বিশেষ করে দুটো কাজের মাঝের দূরত্ব যেখানে প্রায় আড়াইশো কিলোমিটার। মহলিয়াতে লোকেশন শুট করে এল শৌর্য। কলকাতায় ফিরে লুক টেস্টের ফোটো তুলতে হবে। দুটো কাজই সুমিতদার। সিনেমা এবং টিভি সিরিয়ালে স্টিল ফোটোগ্রাফির কাজ সুমিতদার হাত ধরেই শুরু করে শৌর্য। হিসেব মতো সুমিতদাকে 'কাকা' সম্বোধন করা উচিত। খুব ঘনিষ্ঠ না হলেও বাবার বন্ধু ছিল সুমিতদা। ক্লাসমেট। কিন্তু আর্টিস্ট পরিমণ্ডলে কাকা, মামা, জেঠা, পিসি চলে না। বড়রা যত বড়ই হোক সবাই দাদা-দিদি। শিল্পীদের ক্ষেত্রে এই বাড়তি সুবিধেটার যে কে বন্দোবস্ত করেছিল, কে জানে! তবে তিনিও যে একজন শিল্পী, এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই।

হাইওয়ের দু'পাশে এখন জঙ্গল। দু'দণ্ড থামতে ইচ্ছে করছে শৌর্যর। উপায় নেই। চারটের মধ্যে কলকাতায় তাকে ফিরতে হবেই। তার আগে বাড়ি ঢুকে চান-খাওয়া সারলে মা মনে শান্তি পাবে, নিজেও ফ্রেশ মুডে লুকটেস্টের ছবিগুলো তুলতে পারবে। ডেলাইট থাকতে-থাকতে আউটডোর শুট সেরে নিতে হবে, সুমিতদার তেমনটাই নির্দেশ। বেলিভেল তিনটের মধ্যে ঢুকে যেতে। ক'জন ক্যান্ডিডেট অডিশন দিতে আসছে, জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছে শৌর্য। অডিশনে সিলেক্ট হলে ফোটোশুট, তিনটের জায়গায় চারটেতে পৌঁছলে খুব লেট হবে বলে মনে হয় না। অত ঘড়ি ধরে চলে না টলিউড ইন্ডাস্ট্রি। কিন্তু দিনের আলো তো লেট করবে না। হাইওয়ের লাগোয়া এই জঙ্গলটায় যখন বিকেলের হলুদ আলো ছড়িয়ে পড়বে, শৌর্য তখন ইউনিটের একগাদা লোকজনের মাঝে অতি ব্যস্ততায় ফোটো তুলে যাবে সুমিতদার নতুন সিনেমার সম্ভাব্য অভিনেতা-অভিনেত্রীদের।

প্রকৃতির ছবি তুলবে বলেই ফোটোগ্রাফি শিখেছিল শৌর্য। এখন সেই প্রকৃতিকে ফেলে রেখে ছুটতে হচ্ছে রোজগারের ধান্দায়। এমনটাই বোধ হয় বেশিরভাগ মানুষের জীবনে ঘটে। শৌর্যর বাবা হতে চেয়েছিল লেখক, অ্যাড এজেন্সির কপিরাইটার হিসেবে কাজ জুটল প্রথমে। তারপর সেই কোম্পানির প্রোডাকশন অ্যাসিস্ট্যান্ট। বড় অসময়ে চলে গেল বাবা, শৌর্য তখন সবে কলেজে ঢুকেছে। বাবা বলত, ''জেনারেল কোর্সে কলেজে পড়ছিস পড়। রোজগার করবি সেই কাজ করে, যেটাতে আনন্দ পাবি। তার জন্য যদি অন্য ধরনের লেখাপড়া করতে হয়, করবি। জীবনভর অপছন্দের কাজ করে যাওয়া যে কী শাস্তির, তা আমি হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছি!''

এই কথাটা শৌর্যর বেলায় খাটে না। যেহেতু ওর মাথার উপরের ছাদ যথেষ্ট পুরু। বাবা মোটা টাকার চাকরি করত, মা কলেজে পড়ায়। সংসারের প্রয়োজনে অপছন্দের রোজগারের রাস্তা বেছে না নিলেও চলবে। হাতে অনেকটাই সময় নিজের

মতো কেরিয়ার গড়ার। ঘটনাচক্রে ছাব্বিশ বছরেই তা গড়ে উঠেছে। মা তাতে সন্তুষ্ট নয়। বলে, "যতই ইনকাম হোক, সেই তো ফোটোগ্রাফার। তোর বিয়ের জন্য ভদ্র-শিক্ষিত ঘরের মেয়ে পাওয়া যাবে না। এদিকে আবার প্রেম করার মুরোদও নেই। সে যেমন মেয়েই হোক, আমি বিয়েতে আপত্তি করতাম না।"

মা খুবই খোলামনের মানুষ। জীবনকে দেখতে জানে পজিটিভ অ্যাঙ্গেলে। শৌর্যর বাবা ছিল সংশয়ী, দ্বিধাগ্রস্ত। মা বহুবার বলেছে, "চাকরি ছেড়ে লেখালিখিই করো তুমি। আমার যা চাকরি, তাতে স্বচ্ছন্দে একটা সংসার টানা যায়। যে কাজে আনন্দ পাচ্ছ না, কেন করছ সেটা? তুমি তো নিরুপায় নও।"

বাবা বিভিন্ন সময় নানা ধরনের উত্তর দিত। তবে সুর একই। যেমন, "লেখালিখি করতে গিয়ে হয়তো এক পয়সাও রোজগার হবে না। কতটা কী লিখতে পারি, তাই তো জানি না। লিখতে ভালবাসি বললেই তো আর চলবে না। ভাল লিখতে হবে।"

মা যুক্তি দিত, "কোনও স্রষ্টাই বুঝতে পারে না তার সৃষ্টি কতটা উৎকৃষ্ট। বিচার করে অন্যজনে। তুমি তো গল্প-কবিতা বেশ ভালই লিখতে। শুধু আমি নয়, বন্ধুবান্ধবরাও বলত।"

বাবার উত্তর হত, "ওই প্রশংসা নিরপেক্ষ নয়। নিকট সম্পর্ক হওয়ার জন্যই অজান্তে বেশ খানিকটা প্রশ্রয় মিশে থাকে। নামীদামি পত্রিকা বা প্রকাশকের কাছে আমি হয়তো পাত্তাই পাব না।"

মা বলত, "চেষ্টা করে দ্যাখো না, ছাপা হয় কি না। বহু নামী লেখক বেশি বয়সে লেখা শুরু করেছিলেন। তাঁরা কি জানতেন পাঠকদের মনের এত কাছে পৌঁছতে পারবেন?"

বাবার মুখে তখন ব্যঙ্গের হাসি। বলত, "যে সব লেখককে মিন করে কথাটা বলছ, তাঁদের প্রতিভার কাছে আমি নস্যি। তবে একটা সময় অনেক অ্যাভারেজ লেখকও গল্প-উপন্যাস লিখে উপার্জন করেছে। এখন সেই বাজারটাও নেই। লোকে সাহিত্য এখন পড়ে কোথায়? হয় টিভি, নয়তো সোশ্যাল নেটওয়ার্কিংয়ে ব্যস্ত। পাঠক যেখানে নেই, লিখে কী লাভ! ভাল না লাগলেও অ্যাড এজেন্সির কাজটাই আমায় করে যেতে হবে। আর কিছু না হোক টাকাটা তো আসছে। ভিত শক্ত হচ্ছে সংসারের। দু'জনের মধ্যে কে কতদিন কর্মক্ষম থাকব, কে বলতে পারে। বড় একটা অসুখ হলে বিশাল টাকাও সামান্য বলে মনে হবে।"

মা এবার ক্ষান্ত দিত। একদিন বলেছিল, "ঠিক কত টাকা জমা হলে তোমার সংসার বিপন্মুক্ত হবে, হিসেব করে বলো তো আমাকে।"

এর হিসেব যে মেলে না, বাবা ভাল করেই জানত। তবু বিরসমুখে টাকার জন্য চাকরি করে গিয়েছে। রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেল বাবা। জমা টাকার এক পয়সাও খরচ হল না বাবার জন্য।

জঙ্গল শেষ হল। দু'পাশে রুক্ষ শুষ্ক জমি, দূরে গ্রামরেখা, টিলা... অসাধারণ সুন্দর প্রকৃতি! ঝড়ের গতিতে বাইক চললেও মাঠের মাঝে পলাশ-শিমুল চোখ এড়াচ্ছে না। ফুল আসা শুরু হয়েছে গাছগুলোয়। লোকেশনেও পলাশ-শিমুল দেখেছে শৌর্য। সুমিতদা যে সিনেমাটা ডিরেক্ট করতে চলেছে তাতে ওই ফুলগুলো দৃশ্য আবহের কাজ করবে। পলাশ-শিমুল ফুলের সময় চলে গেলে শুটিং স্থগিত রাখা হবে আগামী বসন্ত পর্যন্ত। ঠিক এই শর্ত তুলে সুমিতদা শৌর্যকে তাড়া দিয়ে পরপর দু'দিনে দু'টো ভারী কাজ করাচ্ছে। গত বৃহস্পতিবার একটা ম্যাগাজিনে রান্নার ছবি শুট করছিল শৌর্য, ফোন এল সুমিতদার। বলল, "সামনের শনি-রবি কোনও অ্যাসাইনমেন্ট নিস না। আমার প্রোডাকশনের আর্জেন্ট দুটো কাজ আছে।"

শৌর্য বিরক্ত হয়েছিল খুব। বলেছিল, "দু'দিন আগে কাজ আছে বললে হয় কখনও! একমাসের শিডিউল করা থাকে আমার এবং সেটা তুমি ভাল করেই জানো।"

সুমিতদা বলল, "রবিবার আবার কীসের কাজ রে! স্টুডিয়োয় ছুটি, অফিসকাছারি বন্ধ। শনিবার কাজ থাকতে পারে, ওটা প্লিজ অন্য কাউকে দিয়ে ম্যানেজ কর। আমার কাজটা না হলে প্রোডিউসর পালাবে। প্রোডিউসর পালানোর মানে জানিস তো? বউ পালালে ফিরে আসার একটা চান্স থাকে, প্রোডিউসরের বেলায় নো চান্স। কোনওদিন মুখোমুখি হতে চাইবে না লোকটা।"

নামী পরিচালক ছাড়া প্রোডিউসর পাওয়া যে কী কঠিন, ভাল মতোই বোঝে শৌর্য। সুমিতদার ঝুলিতে একটা ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড থাকলেও আজও তেমন নামী হয়ে উঠতে পারেনি। দশটা ছবি করা হয়ে গেল। শৌর্য বলেছিল, "প্রোডিউসরের এত তাড়া কীসের? দু'দিনের নোটিশে কাজ ধরতে বলছ আমাকে?"

উত্তরে যা বলেছিল সুমিতদা, তাতে শৌর্যর মনে হয়েছিল কাজটা করে দেওয়া জরুরি। অন্য কেউ রিকোয়েস্ট করলে 'না' বলে দিত। যতই হোক সুমিতদাই পছন্দমতো কাজের সুযোগ করে দিয়েছে শৌর্যকে। হ্যাঁ, এটা ঠিকই, অনেক ফরমায়েশি ছবি তুলতে হয়। তবে চাকরি যেহেতু নয়, শৌর্য ফ্রিল্যান্স ফোটোগ্রাফার, নিজের পছন্দমতো ছবি তুলতে পারে সময় বের করে।

যে সিনেমাটার জন্য এত তাড়াহুড়ো করছে সুমিতদা, তার প্রোডিউসরের সন্ধানে কাটিয়েছে দু'বছর। অনেকের সঙ্গেই কথা পাকা হতে-হতে কেঁচে গিয়েছে। এবারের প্রোডিউসর নাকি টাকা হাতে নিয়ে রেডি। সোনার ব্যবসায়ী, জীবনে প্রথম সিনেমায় টাকা ঢালছেন। সুমিতদার গল্পটা নাকি তাঁর ভারী পছন্দ হয়েছে। গল্প অবশ্য সুমিতদার লেখা নয়, উঠতি এক লেখকের। সুমিতদা রাইট কিনে রেখেছে দু'বছরের জন্য। সেই দু'বছর শেষ হতে চলল। রাইট ব্যাক করে যাবে লেখকের কাছে। তার উপর আবার গল্পের প্রেক্ষাপট বসন্তকাল। নাম 'দখিন হাওয়া'। প্রোডিউসরের যেহেতু ভীষণ পছন্দ হয়েছে গল্পটা, বলেছেন, মার্চ-এপ্রিলের মধ্যে শুটিং সেরে ফেলতে। নয়তো পরের বসন্তকাল। গল্পের আশিভাগই আউটডোরে, বাংলা-বিহারের রাঢ় অঞ্চল, আশাং থাকবে মেঘইান, পলাশ-শিমুলে ছেয়ে যাবে চারপাশ, লাল মাটির রাস্তায় ধুলো উড়বে, এসব না থাকলে গল্পের ফ্লেভারটাই আনা যাবে না সিনেমায়। তাই শুটিং করতে হবে বসন্তেই।

অগত্যা শৌর্যকে ছুটতে হল মহলিয়াতে। লোকেশন অনেক আগেই দেখে রেখেছিল সুমিতদা। এখনকার ফোটো তুলে দেখাতে হবে প্রোডিউসরকে। ঘাটশিলা থেকেও তিন কিলোমিটার দূরে লোকেশন। টিলামতো একটা পাহাড়, তার আশপাশের লাল মাটির রাস্তা। আর দুটো পুরনো, জীর্ণ বাড়ি। একটা দোতলা, লোকজন থাকে। অন্যটা একেবারেই ভগ্নদশা। সেই ভেঙে পড়া বাড়িটা ছোটখাটো টিলার উপর। সমস্ত ডিটেলস দিয়ে শৌর্যকে ফোটো তুলতে পাঠিয়ে ছিল সুমিতদা। রবিবার, মানে আজ কোনও অ্যাসাইনমেন্ট ছিল না শৌর্যর। নিজের মতো ফোটো তুলতে বেরত, অথবা আড্ডা মারতে যেত ফোটোগ্রাফি ক্লাবে। গতকাল একটা কাজ নেওয়া ছিল। ক্যালকাটা ক্লাবে একটা কোম্পানির দেওয়া পার্টির ফোটোশুট। কাজটা অর্ধবেলে দিয়ে সুমিতদার কাজে বেরিয়ে পড়েছে শৌর্য। আউটডোরে শুট করতে ভালই লাগে শৌর্যর। লুক টেস্টটাই ভীষণ বোরিং, যেটা এখন

করতে চলেছে।

আবার হাইওয়েকে ঘিরে ধরল জঙ্গল। হেলমেট থাকায় জঙ্গলের গন্ধ পাচ্ছে না শৌর্য। মাথা খোলা থাকলেও হয়তো পেত না, যা স্পিডে চালাচ্ছে বাইক! বহুক্ষণ হল তাকে কোনও গাড়ি ক্রস করে যায়নি, সামনের গাড়িগুলোকে ছুঁয়ে ফেলছে সে, আরও এগিয়ে যাচ্ছে। এই যে এত তৎপরতা, সব বিফলে না যায়। লোকেশন শুট করতে গিয়ে এরকম একটা আশঙ্কা ভর করেছিল শৌর্যর মনে। দু'বছর আগে যে দোতলা পোড়োবাড়িটা দেখে গিয়েছিল সুমিতদা, যেখানে বসবাস করে এক পরিবার। সে বাড়ির জীর্ণদশা আর নেই। সারিয়ে-টারিয়ে রং করা হয়েছে। এখন একেবারে পুরনো ডিজাইনের নতুন বাড়ি। আর ছোট টিলার উপর যে বাড়ি দেখেছিল সুমিতদা, তা প্রায় মাটিতে মিশে গিয়েছে। 'দখিন হাওয়া'র গল্পটা সুমিতদার কাছ থেকে শুনেছে শৌর্য, বাড়ি দু'টো ওভাবে পালটে গেলে, ওই লোকেশনে সিনেমাটা করা প্রায় অসম্ভব। ছবি তোলার আগে সুমিতদাকে ফোন করেছিল শৌর্য। জানাল বাড়ি দু'টোর এখনকার চেহারা। তারপর জানতে চেয়েছিল, "কী করব? তুলব ছবি? মনে তো হচ্ছে তোমার কোনও কাজে লাগবে না।"

সুমিতদা কতটা কী শুনতে পেল, কে জানে! ফোনের সিগনাল উইক ছিল। উত্তরে যা বলল, সেটাও স্পষ্ট কানে আসেনি শৌর্যর। যতটুকু বুঝেছে, সুমিতদা চাইছে, বাড়ি নিয়ে পরে ভাবা যাবে। আপাতত ছবিটবি তুলে প্রোডিউসরকে দেখাতে হবে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রিপ্রোডাকশনের খরচ এবং মেন অ্যাকটর-অ্যাকটেসদের জন্য অ্যাডভান্স চেয়ে প্রোডিউসরের বেশ কিছু টাকা খসিয়ে দিতে হবে। তা হলে আর চট করে প্রোজেক্ট ফেলে পালাবে না। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে অদ্ভুত সব মজার ব্যাপার রয়। সুমিতদা যে বলছে প্রোডিউসরের টাকা খসিয়ে দিলে পালাবে না, এটা নিছকই সান্ত্বনা। ইন্ডাস্ট্রিতে এমন বহু ছবি পড়ে আছে, যার ষাট-সত্তর শতাংশ কাজের পর হাত গুটিয়ে নিয়েছে প্রোডিউসর। গোটা সিনেমা হয়ে আছে, রিলিজের ব্যবস্থা হয়নি, এ ঘটনাও কিছু কম নেই। তবু যে সব মানুষ একবার সিনেমার জগতে এসে কাজ শুরু করেছে, জড়িয়ে পড়েছে অদ্ভুত মোহে। এত অনিশ্চয়তা এই ফিল্ডে, তবু একজন ট্রলিম্যানও এই কাজ ছেড়ে অন্য কাজে গিয়ে শান্তি পায় না। আগুনে ঝাঁপ দেওয়া পতঙ্গের মতো শুটিংয়ের আলোর কাছে গিয়ে তারা ভিড় করে।

শৌর্য কিন্তু সিনেমা-সিরিয়ালের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা চালায়। ইনকামের জন্য ম্যাগাজিনের মডেল শুটিং বা প্রোডাক্ট ফোটোগ্রাফির উপর জোর দেয় বেশি। সিনেমার মোহ তাকে পেয়ে বসেনি। ফোটোগ্রাফিকে পেশা হিসেবে নেওয়ার সময় সুমিতদার ইউনিটে কাজ করেছে, তারপর যতটুকু যা করেছে, অতি কাছের মানুষের অনুরোধে অথবা হাতে যখন অন্য কাজ নেই, স্রেফ টাকার জন্য। সাধারণ মানুষেরও সিনেমার কাজকর্ম নিয়ে অপার কৌতূহল। মহলিয়ায় যে দোতলা বাড়ির ছবি তুলতে বলেছিল সুমিতদা, সেখানে এখন নতুন পরিবার থাকে। সুমিতদা যে সময় দেখে গিয়েছিল বাড়িটা তখনকার বাসিন্দা এখন নেই। তারা বাড়ি বিক্রি করে চলে গিয়েছে। ছবি তুলতে আসার আগে শৌর্য সুমিতদাকে বলেছিল, "বাড়ির ভিতরের ছবি তুলতে দেবে মালিক? তুমি যে আমাকে পাঠাচ্ছ, জানিয়ে রেখেছ?"

সুমিতদা বলেছিল, "আরেঃ, বাড়ির মালিককে তো ফোনে পাচ্ছি না! নাম্বার পালটেছে বোধ হয়। তুই যা না, ওরা লোক ভাল। তুলতে দেবে ছবি। দু'বছর আগে যখন রেইকি করতে গিয়েছিলাম, ওদের বলেছিলাম এ বাড়িতে শুটিং করব। শুনে ওদের কী আনন্দ! তুই শুধু আমার নামটা বলে শুটিং তাড়াতাড়ি শুরু হচ্ছে জানিয়ে দিবি। দেখবি ওদের উৎসাহ!" সেই ভরসায় ও বাড়ির কড়া নেড়েছিল শৌর্য। তার খানিক আগেই সুমিতদাকে ফোনে জানিয়েছে বাড়ির রেনোভেশন হয়েছে। তা সত্ত্বেও ফোটো তুলতে বলেছে সুমিতদা। কড়া নাড়া শুনে বাড়ির দরজা খুললেন মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক। শৌর্য সুমিতদার রেফারেন্স দিয়ে কী কাজে এসেছে বলেছিল। ভদ্রলোক জানালেন তিনি বাড়িটার নতুন মালিক। এখানে শুটিং হোক চান না। হোঁচট খেয়ে শৌর্য বলেছিল, শুটিংয়ের জন্য ভাড়া বাবদ ওঁরা বেশ কিছু টাকা পাবেন।

টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্তটা স্পটে দাঁড়িয়ে নিয়েছিল শৌর্য। জানা নেই বাজেটে সুমিতদা ভাড়ার অঙ্ক ধরেছে কি না। ভদ্রলোক তাতেও রাজি হলেন না। শৌর্য তখন ভাবতে শুরু করেছিল আর কী বলে বাড়িওলাকে প্রলুব্ধ করা যায়। পেয়েও গিয়েছিল একটা রাস্তা, তাড়াহুড়োতে বুঝতে পারেনি, ওটা রাস্তা নয়, একটা খাদ, শৌর্য বলেছিল, সিনেমাটাতে আপনারও একটা চরিত্র আছে। রোল ছোট, কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। সুমিতদা বলেছে বাড়িওয়ালাকে দিয়ে অভিনয়টা করাবে।

ভদ্রলোক বললেন, "সেটা হয়তো উনি আগের বাড়িওয়ালার সম্বন্ধে বলেছিলেন। যাঁর সঙ্গে ওঁর দেখা হয়েছিল। কাউকে না দেখে তো আর পার্ট দেওয়া যায় না। তা ছাড়া সিনেমায় অভিনয়ের কোনও ইচ্ছেও আমার নেই।"

শৌর্য পড়েছিল মহাগাড্ডায়। কোনও প্রলোভনেই কাজ হচ্ছে না। এমন সময় পরদা সরিয়ে ঘরে এন্ট্রি নিয়েছিলেন ভদ্রলোকের স্ত্রী। পরদার আড়াল থেকে সব কথা শুনেছেন বোঝা গেল। বললেন, "হোক না বাড়িতে শুটিং। ক্ষতি কী! আমি কোনওদিন শুটিং দেখিনি।"

ভদ্রলোক বললেন, "শুটিংয়ের জন্য ক্ষতি হবে ছেলেমেয়ের লেখাপড়ায়। সে এক মহাযজ্ঞ, বড়-বড় লাইট স্ট্যান্ড, একগাদা লোকজন, হইচই... পুরো তছনছ করে দিয়ে যাবে ঘরের জিনিসপত্র।"

গৃহিণী একথায় দমলেন না। বলেছিলেন, "সে সব আমি গুছিয়ে নেব। ছেলে-মেয়ে ক'টা দিন শুটিং দেখবে। এখন তো পড়ার চাপ নেই। অনেক কিছু জানতে পারবে, শিখবে। সব কিছু থেকেই শেখার আছে।"

স্ত্রীর উৎসাহে বাড়িওয়ালার অনড় অবস্থান বুঝি একটু আলগা হল। উত্তর খুঁজে পাচ্ছিলেন না। ততক্ষণে ঘরে ঢুকে পড়েছে বাড়ির দুই খুদে সদস্য। হয়তো লেখাপড়া ছেড়ে উঠে এসেছিল। ছেলেটির বয়স দশ-এগারো, মেয়েটি আরও একটু ছোট। দু'জনেই মায়ের কাছে জানতে চাইছিল তাদের বাড়িতে কী ঘটতে চলেছে, নতুন লোকটি এসেছে কেন?

সন্তানদের তোষ করে উত্তর দিয়ে ভদ্রমহিলা শৌর্যর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, "আপনাদের সিনেমায় নায়ক, নায়িকা কোন দু'জন?"

টলিউডের সব চেয়ে হিট জুটির নাম করে দিয়েছিল শৌর্য। ভদ্রমহিলা তো খুব খুশি। বলেছিলেন, "ওরে বাবা, ওদের সামনে থেকে দেখব, ভাবতেই পারছি না!"

মহিলার ওরকম সরল উচ্ছ্বাস দেখে একটু হলেও অপরাধবোধে ভুগছিল শৌর্য। সুমিতদা লিড রোলে কাকে কাকে নিচ্ছে কিছুই জানে না সে। জীর্ণ বাড়ি নাতুন হয়ে যাওয়ায় আদৌ এখানে শুটিং হবে কি না, তারও নিশ্চয়তাও নেই। শৌর্য শুধু জানে, যে করে হোক

এ বাড়ির ছবি তুলে নিয়ে যেতে হবে। প্রফেশনাল কাজের জগতে এ ধরনের মিথ্যাচরণ প্রায় নির্দোষ বলেই ধরা হয়। তবু খারাপ লাগছিল শৌর্যর।

নানা গল্পগাছায় শৌর্য যখন জমিয়ে নিয়েছে, বাড়িওয়ালা স্ত্রীকে বললেন, "অফিসের ভাত দাও। বেরতে হবে তো।"

"এই রে, দেখেছ! আমি তো ভুলেই গিয়েছি, তুমি বেরবে!" বলে ভিতর দিকে হুটতেপুটতে এগোলেন মহিলা। বাড়িওয়ালা তখন শৌর্যকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "শুধু এবাড়ির ছবি তুলবেন, নাকি আশপাশে আরও কোনও স্পটের?"

শৌর্য বলেছিল, "এই এলাকার বেশ কিছু জায়গার ছবি তুলতে হবে। সিনেমায় আশি শতাংশ ঘটনা ঘটবে এখানে।"

বাড়িওয়ালা আগের চেয়ে অনেকটাই নরম। বলেছিলেন, "তার মানে তো আপনার অনেকক্ষণের কাজ। দুপুরের খাবারটা আমাদের বাড়িতেই সেরে নেবেন'খন। গিন্নিকে বলে যাচ্ছি। অবশ্য আমি না বললেও ও আপনাকে ঠিক খাইয়ে ছাড়ত।"

এত অল্প পরিচয়ে কারও বাড়িতে লাঞ্চ-ডিনার করার কথা ভাবতেই পারে না শৌর্য। কিন্তু ও বাড়ির মানুষজন, চারপাশের সহজ-স্বাভাবিক প্রকৃতির জন্যই শৌর্যর 'না' বলতে ইচ্ছে হয়নি। ও বাড়িতে চা খেয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল আশপাশের ছবি তুলতে। ফিরে এসে বউদির বাড়ির ছবি তুলতে লাগল। মহিলাকে 'বউদি' সম্বোধনই করছিল। ও বাড়ির রান্নাঘর, দোতলায় ওঠার সিঁড়ি, উঠোনের ছবি, তারপর ছাদের চতুর্দিক। দোতলার ঘরের জানলা থেকে উঠোন, মানে সুমিতদা যেমন-যেমন বলেছে, তেমনই ছবি তুলে গিয়েছে শৌর্য। 'দখিন হাওয়া'র গল্পটাও যেহেতু জানে, শুটিং স্লোনগুলো আন্দাজ করতে পারছিল। এরকম একটা বাড়ি গল্পটার বড় চরিত্র।

দুপুরের স্নান হল ও বাড়িতেই। খাওয়ার সময় অনেক গল্প হল বউদি আর বাচ্চা দুটোর সঙ্গে। মেয়েটার নাম স্বর্ণতোয়া, কাছেই সুবর্ণরেখা নদী, তার সঙ্গে মিলিয়ে রাখা হয়েছে। ছেলেটা তুণীর, আদিবাসীদের তির রাখার আধার। এলাকাটা আদিবাসী অধ্যুষিত। শনিবার বাচ্চা দুটোর স্কুল ছুটি। মলয়দা, মানে বাড়িওয়ালা গালুডির এক কারখানার অ্যাকাউন্টসের হেড। শনিবার হাফ ডে। ফিরে এলেন বিকেল শেষ হওয়ার আগে। শৌর্য ততক্ষণে দোতলার ঘরে গিয়ে ঘণ্টাদুয়েকের ছোট্ট ঘুম দিয়েছে। চারপাশ এত নির্জন, ঘুমটা সঙ্গে গড়িয়ে যেতে পারত। মলয়দার বাইকের শব্দে ভাঙল ঘুম। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসেছিল শৌর্য। ওই আওয়াজে ঘুম না ভাঙলে এরা হয়তো ডাকতও না। সদ্য পরিচিতের বাড়িতে ওভাবে ঘুমিয়ে পড়াতে ভারী সংকোচ বোধ করছিল শৌর্য। ক্যামেরার ব্যাগ কাঁধে নিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে আসছিল সিঁড়ি দিয়ে। মুখোমুখি হয়েছিল চন্দ্রাবউদির। জিজ্ঞেস করলেন, "চা খাবেন তো? আপনার দাদা ফিরেছেন।"

কুণ্ঠার সঙ্গে শৌর্য বলেছিল, "খাব। খেয়েই বেরিয়ে যাব। সরি, একেবারে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।"

"তাতে অসুবিধে কী?" বলে রান্নাঘরের দিকে চলে গিয়েছিলেন বউদি।

এককেলাতেই এরা কত আপন করে নিয়েছে শৌর্যকে! শহর হলে এটা হত না। ওখানে লোক বেশি, অবিশ্বাসও বেশি। বসার ঘরে ঢুকেতেই মলয়দা জানতে চাইলেন, "আজই ফিরবেন নাকি কলকাতায়?"

শৌর্য বলেছিল, "না, অন্ধকারে হাইওয়েতে গাড়ি চালানো রিস্ক হয়ে যায়। আর একটু পরেই তো আলো পড়ে যাবে। কাল ভোরে বেরিয়ে যাব।"

"রাতটা তা হলে এ বাড়িতেই কাটিয়ে যান, আপনার সঙ্গে গল্প করার তো সময়ই পেলাম না..." বলেছিলেন মলয়দা।

প্রস্তাবটার জন্য প্রস্তুত ছিল না শৌর্য, বলে উঠেছিল, "না, না। ঘাটশিলায় আমার নামে হোটেলের রুম বুক করা আছে।"

আবারও সিলি মিসটেক। মিথ্যেটা জমল না। মলয়দা এলাকার লোক। জিজ্ঞেস করেছিলেন, "ঘাটশিলার কোন হোটেল?"

একটারও নাম জানে না শৌর্য। বুদ্ধি করে বলেছিল, "ঘাটশিলায় পৌঁছে প্রোডাকশানকে ফোন করে জেনে নেব।"

মলয়দার সঙ্গে চা খেতে-খেতে একটা কৌতূহল মিটিয়ে নিয়েছিল শৌর্য। প্রশ্নটা অনেকক্ষণ ধরেই মনে উঁকি মারছিল। জিজ্ঞেস করেছিল, "আপনি এরকম একটা ফাঁকা-নির্জন জায়গায় বাড়ি কিনলেন কেন? অফিস তো গালুডিতে, ওখানেই থাকতে পারতেন।"

"গালুডিতেই ছিলাম, নিজের বাড়ি ছিল... ক্রমশ ব্যস্ত শহর হয়ে উঠছে জায়গাটা, তাই একটু দূরে চলে এলাম," বলেছিলেন মলয়দা।

শৌর্য বলেছিল, "শহরের অনেক সুবিধেও তো আছে। বাচ্চাদের লেখাপড়া, হাতের কাছে ডাক্তার হাসপাতাল। এখান থেকে আপনার অফিস, বাচ্চাদের স্কুল যাতায়াতেই তো অনেকটা সময় খরচ হয়ে যায়। তারপর এত ফাঁকা জায়গায় আছেন, চুরি-ডাকাতির ভয়ও নিশ্চয়ই আছে।"

"চুরি-ডাকাতির মতো মূল্যবান কিছু আমার কাছে নেই। চোর-ডাকাতরাও নিশ্চয়ই সে খবর রাখে। তা ছাড়া চুরি-ডাকাতির ভয়ে গোটা জীবনটা শহরে বন্দি করে রাখার কোনও মানে হয় না। একটাই তো জীবন, এবং সেটাও খুব একটা বড় নয়। প্রকৃতিকে না দেখেই মরে যাব! এখানে কী অসাধারণ সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত হয়, আপনি ভাবতে পারবেন না। কখনও আবার দিগন্ত ঝাপসা করে দেওয়া অঝোর বৃষ্টি। দেখা যায় রাতের তারাভরা আকাশ। এগুলো তো আমার বাচ্চাদেরও দেখা দরকার। হাসপাতাল-ডাক্তার তো খুব দূরে নয়, বাইকে আধঘণ্টা। আর এখানে থাকলে ঘন-ঘন ডাক্তার-হাসপাতালে যেতে হয় না..." বলে নিজের খেয়ালে হাসছিলেন মলয়দা। বাবার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল শৌর্যর, প্রায়ই বলত, "বুঝলি বাবান, গ্রামের দিকে একটা বাড়ি করে রাখতে হবে। শহরে হাঁপিয়ে উঠলে ক'টা দিন আমরা ওখানে গিয়ে থেকে আসব। সেই বাড়ি লাগোয়া একটা টলটলে পুকুর থাকবে। মাছ ধরব সেখানে..." বলতে-বলতে বড় করে শ্বাস টানত বাবা। শহরের বাতাসই ঢুকত বুকে। গ্রামে বাড়ি হয়নি শৌর্যদের। ইচ্ছে থাকলেও অনেকের যেমন হয়ে ওঠে না। বাবা সময়ও পায়নি, জীবন ছেড়ে চলে যেতে হল তাড়াতাড়ি। জীবন সত্যিই বড় ছোট।

গতকাল সন্ধের মুখে ওদের বাড়ি থেকে যখন ঘাটশিলার হোটেলের উদ্দেশে বেরিয়ে আসছে শৌর্য, বাড়ির সবাই দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে বাইকে উঠে পড়েছিল শৌর্য। মনে-মনে ঠিক করে নেয়, এখানে যদি শুটিং নাও হয়, সে একাই আবার আসবে। কাটিয়ে যাবে দুটো দিন। দেখবে প্রকৃতির অপার বৈভব। ভাবতে-ভাবতেই বাইকের স্পিড কমাতে হল। রাস্তা ক্রস করছে ছাগল, সঙ্গে তিন সন্ততি। এরা ভীষণ দিশেহারা প্রকৃতির। গাড়ির শব্দ পেলে কে কোনদিকে দৌড়বে, কোনও ঠিক নেই! রাস্তার দু'পাশের জঙ্গল অনেকক্ষণ উধাও হয়েছে। এখন ফসলভর্তি মাঠ। ছাগলগুলোকে পাশ কাটিয়ে ফের

স্পিড তুলল শৌর্য। হাইওয়ের মাইল ফলক জানাল কলকাতা এখনও একশো আশি কিলোমিটার দূরে। ঘাটশিলার হোটেল থেকে আরও খানিকটা আগে বেরতে পারলে ভাল হত। বেশ সকালের দিকেই ঘুম ভেঙেছিল শৌর্যর, ব্রেকফাস্ট দিতে দেরি করল হোটেলের লোক। তারপর স্থানীয় অবরোধের জন্যও ওর বেরতে বেশ খানিকটা বেলা হয়ে গিয়েছে। এখানে আসার আগে মা বলেছিল, "অতটা দূর যাচ্ছিস, গাড়িটা নিয়ে যা। হাইওয়েতে টানা চার-পাঁচ ঘণ্টা বাইক চালানো ঠিক হবে না।"

বেরনোর আগের রাতে খেতে বসে কথাগুলো বলেছিল মা। শৌর্য বলে, "লোকেশন গ্রামের কতটা ভিতরে জানি না। হয়তো গাড়ি যাওয়ার মতো রাস্তা নেই। বাইকের এটাই তো সুবিধে। যে কোনও ধরনের রাস্তায় চালানো যায়।"

মা বলেছিল, "আসল কথাটা বল, বাবার মতো তোরও গাড়ির প্রতি অনীহা। পারতপক্ষে চড়িস না। গাড়িটা এবার আমি বেচে দেব ভাবছি।"

"ফালতু সেন্টিমেন্টাল হচ্ছ। গাড়ি চালানো, রাস্তার ব্যাপারস্যাপার কিছু বোঝো?" মাকে খানিকটা ধমকই দিয়েছিল শৌর্য।

গুম মেরে গিয়েছিল মা। আর কিছু বলেনি। শৌর্যকে গাড়ি নিয়ে বেরতে বলাটা মায়ের প্রায় মুদ্রাদোষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই এটা হয়েছে। মা কলেজ

যাওয়াতের সুবিধের জন্য গাড়িটা কিনেছিল। কলেজ বরানগরে। যাদবপুর থেকে পাবলিক ট্রান্সপোর্টে যাওয়া আসা মায়ের আর পোষাচ্ছিল না। কলেজে ছুটিছাটা থাকে অনেক, বাবার ছুটি সপ্তাহে একদিন। মায়ের যেদিন কলেজ থাকত না, বাবাকে বলত গাড়িটা নিয়ে অফিস যাও। মানিককাকা শৌর্যদের মাইনে করা ড্রাইভার। এখনও মানিককাকাই চালায়। বাবা গাড়ি নিয়ে যেতে চাইত না। বলত, "ধূর, গাড়িফাড়ির কী দরকার অফিস তো কাছেই ,পার্ক স্ট্রিট। বাসে ভিড় থাকলে ট্যাক্সি নিয়ে নেব।"

"কেন নেবে ট্যাক্সি? মানিক বসে-বসে মাইনে নেবে, ব্যাঙ্কে গাড়ির ইনস্টলমেন্ট শোধ করব, আর গাড়িটা গ্যারেজবন্দি হয়ে পড়ে থাকবে! তার উপর আবার ট্যাক্সিভাড়া! অযথা এভাবে টাকা অপচয়ের কোনও মানে হয়!" মাথা গরম করে বলে উঠত মা।

মশকরার হাসি হেসে বাবা বলত, "গাড়ি করে অফিস গেলে কাজের আগে ওয়ার্ম আপটা ঠিক হয় না। স্পিড আসতে দেরি হয় কাজে। রাস্তায় বেরিয়ে দৌড়ে বাস ধরব, ট্যাক্সি দাঁড় করাব ছুটে গিয়ে। এই যে একটা হন্তদন্ত ভাব, এটাতেই গা বেশ গরম হয়ে যায়।"

বাবাকে একা গাড়ি ব্যবহার করতে বললেই, এরকম নিতানতুন ছুতোনাতা তুলত। মা একবার বাবাকে গাড়ি চালানো শিখে নেওয়ার জন্য চাপ দিতে লাগল। তাতে যদি বাবার গাড়ি চড়ার প্রতি আগ্রহ জন্মায়। বাবা কিছুতেই শিখবে না। অজুহাত দিল বয়সের। বলল, "এখন রিফ্লেক্স কমে গিয়েছে। বাইক-স্কুটার চালানোর অভিজ্ঞতাও নেই। আমার ড্রাইভিংয়ে কারও যদি প্রাণ যায়, খুব বাজে ব্যাপার হবে। জেল খাটতে হতে পারে।"

বাবার গুরুকম নানা টালবাহানার মাঝে শৌর্য গাড়ি চালানো শিখে নিল মানিককাকার কাছে। তখন ক্লাস ইলেভেন। বাইক চালানো শিখল তারপরে। শৌর্যকে গাড়ি, বাইক চালাতে দেখলে বারণ করত না বাবা। নিজের বেলায় যত অস্বস্তি। বাবার গাড়ি এড়িয়ে যাওয়াটা বছরতিনেক সহ্য করার পর মা বিস্ফোরণ ঘটাল একদিন। বাবার পা মচকে ছিল আগের দিন, হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে, তবু বাস-ট্যাক্সিতেই যাবে অফিস। টেবিলে তখন খেতে বসেছে বাবা, এরপর অফিস যাবে। মা বলল, "মানিককে ডাকছি। আজ গাড়িতে চলে যাও।"

"না, না, দরকার নেই, খুব একটা সমস্যা হচ্ছে না," বলেছিল বাবা।

মা বলল, "তোমার পায়ের ব্যথার চেয়ে বেশি সমস্যা ওই গাড়িটাতে অফিসে যাওয়া!"

বাবা আন্দাজ করতে পেরেছিল মা কোনও কড়া কথা বলতে চলেছে। তাই রাগ কমাতে হাসিমুখ তুলে বলেছিস, "আচ্ছা, আমি কি তোমাদের সঙ্গে গাড়ি চেপে এদিক-ওদিক যাই না? বিয়ে বাড়ি, শপিং, এমনকি শর্ট ট্রিপেও তো গিয়েছি।"

মা বলল, "কিন্তু একা গাড়ি চড়াটা তুমি সব সময় এড়িয়েই গিয়েছ। কারণ, গাড়িটা আমি কিনেছি। বউয়ের গাড়িতে একা চাপতে তোমার লজ্জা হয়। পৌরুষে বাধে। অথচ নিজেকে উদারমনস্ক মানুষ প্রমাণ করার চেষ্টা করে যাও সর্বক্ষণ। লোকে তোমাকে তাই বলেই জানে। আসলে পুরোটা ভান।"

খাওয়া থেমে গিয়েছিল বাবার। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল বিস্ময়ে কষ্টে আহত চোখ-মুখ কুঁচকে যাচ্ছিল। বাবার এই এক্সপ্রেশন আজও চোখের সামনে ভাসে শৌর্যর। ওই দিন জানলার ধারে সোফায় বসে কাগজ পড়ছিল শৌর্য। মাকে এধরনের কড়া কথা আগে কোনও দিন বলতে শোনেনি। একটু সময় নিয়ে বাবা বলেছিল, "মানিককে ডাকো। গাড়িতেই যাব অফিস।"

সেদিন মানিককাকা বাবাকে অফিসে দিয়ে এল, নিয়েও এল। শৌর্য সারাদিন ভেবে গেল, সত্যিই কি তাই? বাবা মায়ের রোজগারটাকে আলাদা করে দেখে? মায়ের উপার্জন নিজের জন্য ব্যবহার হোক, চায় না? তাই হলে যে শৌর্য এতদিন মনে করত তারা তিনজন একটাই ইউনিট, সেটা ভুল? অদৃশ্য একটা ভেদাভেদ আছে!

ভাবনাটা শৌর্যকে মানসিকভাবে অস্থির করে তুলছিল। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিল সে। মনে হচ্ছিল একসঙ্গে থাকলেও, আসলে তারা তিনজনই একা। মা মুখ খোলার ফলে এতদিনে বিষয়টা প্রকাশ্যে এল।

ডিনারে বসার আগে বাবাকে খানিকক্ষণের জন্য একা

পেয়েছিল শৌর্য। মা তখন কিচেনে। বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিল, "সত্যি কি মা কিনেছে বলেই গাড়িতে তুমি উঠতে চাও না?"

মাথা নেড়ে 'না' বুঝিয়ে ছিল বাবা। তারপর নিরাসক্ত গলায় বলতে শুরু করেছিল, "তোর মা কেন যে আমায় ভুল বুঝছে, মাথায় আসছে না। ও তো দেখেছে বৈভব আমি বরাবরই এড়িয়ে চলি। তুইও নিশ্চয়ই লক্ষ করেছিস বড়লোকি শখ-শৌখিনতার প্রতি আমার আগ্রহ কম।"

কথা কেটে শৌর্য বলেছিল, "গাড়ি চড়াকে আজকাল আর বড়লোকি বলে ধরা হয় না বাবা। গাড়ি এখন প্রয়োজনের মধ্যে পড়ে। মা ওটা শখ করে কেনেনি। দরকার পড়েছে বলেই কিনেছে।"

"কিন্তু আমার তো দরকার নেই! তোর মায়ের যাতায়াতে অসুবিধে হয়, চকুক গাড়ি... আমাকে কেন জোর করছে?" বলেছিল বাবা। শৌর্য বলেছিল, "তুমিও যদি এক দু'দিন অফিসে নিয়ে যাও গাড়ি, সমস্যাটা কোথায়? যথেষ্ট উঁচু পোস্টে চাকরি করো। অফিসের লোক টোনটিটকিরি করবে, তা-ও তো নয়।"

"না, তা কেউ করবে না... কিন্তু আমার ভিতর থেকেই কে যেন দুয়ো দেয়! বলে, মানকুণ্ডু স্টেশন থেকে তোমাদের বাড়ির দূরত্ব ছিল আড়াই কিলোমিটার, তোমার বাবা রোজ পায়ে হেঁটে অফিসের ট্রেন ধরতে যেতেন, বাড়িতে একটাই সাইকেল, দূরে কোথাও যেতে হলে বাড়ির দুই ছেলে সেটা ব্যবহার করত... কত কষ্ট করে তোমাদের লেখাপড়া শিখিয়েছেন বাবা! এমন নয় যে, ওরকম পরিবার এখন নেই, প্রচুর আছে, বাবারা ছেলেমেয়ের জন্য বাস-অটোর ভাড়া বাঁচিয়ে হেঁটে চলেছে, মা কম খেয়ে সন্তানদের পেট ভরাচ্ছেন, তুমি কলেজে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতে... চাইতে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হোক... হয়নি, তুমি চলেছ গাড়ি চেপে অফিসে... " আরও অনেক কথা বলে যাচ্ছিল বাবা। বেশ আবেগতাড়িত হয়ে পড়েছিল। শৌর্য বাবার লজিকগুলো ধরতে পারলেও অনুভূতিটা সে ভাবে ছুঁতে পারছিল না। কেননা, সে অভাবের সংসারে বড় হয়নি। তখন কলেজেও ঢোকেনি, ধনতন্ত্র, সাম্যবাদ নিয়ে ছাত্ররা লেকচার দেয় কি না, জানে না। বাবার কথা শেষ হওয়ার পর বলেছিল, "তুমি আমাকে যা-যা বললে। মাকেও বলো। মা হয়তো তা হলে তোমাকে আর ভুল বুঝবে না।"

"ধর, তোর মা আমার ফিলিংসটা বুঝল। তারপর কী করবে জানিস? গাড়িটা বিক্রি করে আবার আগের মতো বাসে-অটোয় যাবে কলেজে, যা তোর মায়ের স্বাস্থ্যের পক্ষে ঠিক হবে না। আমার ভাবনাটাকে আদর্শ মনে করবে। মনের ভিতর থেকে শখ-শৌখিনতা করতে আমি যে বাধাটা পাই, সেটা পাবে না। কারণ, ওর জীবনটা কেটেছে স্বচ্ছলতায়। আমাকে কেন অনুসরণ করবে সে? আমি তো আদর্শ মানুষ হতে পারিনি।"

বাবার ওই কথাগুলো থেকে শৌর্য এটুকু অন্তত বুঝেছিল, ইউনাইটেড বলে কিছু হয় না। ওটা একটা শূন্যলাবিধি। প্রত্যেক মানুষই আলাদা। এক সংসারে থাকলেও প্রত্যেকে আলাদা। মায়ের আর জানা হল না বাবা কেন গাড়ি অ্যাভয়েড করত। শৌর্য বলতে যায়নি। মা এখনও মনে করে বাবা মেল শভিনিস্ট। বউয়ের গাড়িটাকে নিজের মনে করতে পারত না। বাবার মৃত্যুর কারণ সেটাই বলে মনে করে মা। বাস থেকে নামতেই একটা গাড়ি ধাক্কা মেরেছিল বাবাকে। হেড ইনজুরি, ইন্টারনাল হেমারেজ। সেদিন শৌর্যদের গাড়ি বাড়ির গ্যারেজেই পড়েছিল।

শৌর্য অনেকবার ভেবেছে বাবার সম্বন্ধে মায়ের ভুল ধারণাটা ভাঙিয়ে দেবে। পিছিয়ে এসেছে প্রতিবার। সব শুনে মা যদি বলে, 'ওটাও একটা অজুহাত। সব মিথ্যে। তোকে বুঝিয়েছে, তুইও বুঝে গিয়েছিস। কলেজে তোর বাবা যে দলের ছাত্ররাজনীতি করত, তাদের নেতারা কি এখন গাড়ি চড়ে না? গাড়ি তো কোন ছার, তাদের বিপুল সম্পত্তি আর লাইফস্টাইল দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। এরাই এক সময় সাম্যবাদের কথা বলত!'

মায়ের যুক্তি খণ্ডাতে পারবে না শৌর্য। এদিকে বাবার দৃষ্টিভঙ্গি সে মনের কোণে সযত্নে রেখে দিয়েছে। কোনও ভাবেই অপমানিত হতে দেবে না সেই অনুভূতিটাকে।

দূরে হাইওয়ের উপর আড়াআড়ি একটা কালো রেখা দেখা যাচ্ছে! কী ব্যাপার! বাইক যত এগোচ্ছে স্পষ্ট হচ্ছে রেখাটা। সর্বনাশ করেছে, সার দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে গাড়ি! কিছু ঘটেছে সামনে। কোনও গাড়িই এগোতে পারছে না। এখানে কতটা টাইম খাবে, কে জানে!

শৌর্য বাইক নিয়ে দাঁড়াল গাড়ির জটলার পাশে। সকলের দাঁড়িয়ে পড়ার কারণও বোঝা গেল। থেমে যাওয়াটা কাঙ্ক্ষিত না হলেও, কারণটা কিন্তু বেশ রোমাঞ্চকর! হাতির দল পার হচ্ছে রাস্তা। ঠিক পার হচ্ছে বলা যায় না, জুড়ে রেখেছে রাস্তা। ছোট-বড় মিলিয়ে অনেক হাতি। রাস্তার এক পাশে অনাবাদী পাথুরে জমি, ঝোপজঙ্গল। অন্য পাশে চাষের জমি। বোঝাই যাচ্ছে হাতির পাল এসেছে পাথুরে জমি ধরেই। দলমা রেঞ্জ খুব দূরে নয়। ওখানকারই বাসিন্দা এরা। বুনো হাতি আগে কখনও দেখেনি শৌর্য। মাথা থেকে হেলমেট খুলে ফেলে। বেশ স্বস্তি লাগছে। রোদ আছে, তেজ নেই। গাড়ি থামানোর ফলে হাওয়া শান্ত। বুক ভরে শ্বাস নেয় শৌর্য। এখন আর টেনশন করে লাভ নেই। হাতিরা না সরা অবধি কলকাতার দিকে এগনো যাবে না। সার্কাস বা চিড়িয়াখানার হাতিদের তুলনায় এই হাতিগুলো ধুলোয় ধূসর। আকারে যেন অনেকটাই বড়। আর অদ্ভুত একটা 'ডোন্ট কেয়ার' ভাব। কোনও গাড়ি হর্ন তো দিচ্ছেই না, এত লোক, তবু একটাও কথা নেই আশপাশে। সকলেই ভয়ে নিশ্চুপ। হাতির পাল যদি খেপে গিয়ে এগিয়ে আসে, গাড়ি রেখে পালানোই বাঁচার একমাত্র উপায়। হাতির পালের ওপ্রান্তেও পরের পর গাড়ি জমা হচ্ছে। শৌর্য পিঠের ব্যাগটা সামনে আনে। বুনো হাতির ছবি তোলার সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে না।

ব্যাগ থেকে ক্যামেরাটা বের করে জুম লেন্সটা লাগাতে যাবে শৌর্য, পাশে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির জানলা থেকে এক মাঝবয়সী বলে উঠলেন, "ফোটো তোলার হলে এখান থেকেই তুলুন। এত লম্বা লেন্স নিয়ে হাতির কাছাকাছি যাওয়া ঠিক হবে না।"

"বন্দুক ভাবতে পারে বলে মনে করছেন?" ঠোঁটের কোণে হাসি এনে বলল শৌর্য।

দামি গাড়িতে বসে থাকা লোকটা মাথা নেড়ে সায় দিলেন। শৌর্য বলল, "মনে হয় না। ক্যামেরা এরা চেনে। মিডিয়া এত ছবি তোলে! দেখলেন হয়তো এগিয়ে এসে পোজ দিল।"

কথাটা বলে বাইক স্ট্যান্ড করে নেমে এল শৌর্য। গলায় ঝুলছে ক্যামেরা। ভদ্রলোকের দিকে আর তাকায়নি। আন্দাজ করতে পারছে ওঁর এক্সপ্রেশন।

হাইওয়ে থেকে পাথুরে জমিতে নেমে এসেছে শৌর্য। হাতির পালের দিকে এগিয়ে গেল খানিকটা। আর কী আশ্চর্য! হাতির পালের ভাল বাংলাটা এসে গেল মাথায়, 'যূথবাহিনী'। এই অ্যাঙ্গল থেকে আর কোনও গাড়ি দেখা যাচ্ছে না। যেহেতু রাস্তা থেকে খানিকটা নীচে নেমে এসেছে শৌর্য, পূর্ণবয়স্ক হাতিগুলোকে পাহাড় সদৃশ লাগছে। ভিউ ফাইন্ডারে চোখ রাখতেই মনে হল

হাজার-হাজার বছর পিছিয়ে গেল সময়। যখন গোটা এলাকাটাই ছিল হাতি এবং অন্যান্য বন্য পশুর। মানুষের অনুপ্রবেশ ঘটেনি।

নানা অ্যাঙ্গল থেকে ছবি নিতে থাকল শৌর্য। অনেকদিন ফোটো পাঠানো হয়নি বিদেশের ফোটোগ্রাফি অ্যাসোসিয়েশনগুলোয়। ওরা খুব উৎসাহ দেয়। ইতিমধ্যে গোটাচারেক প্রাইজ় পেয়েছে শৌর্য। বিক্রিও হয়েছে ফোটো। তবে প্রথম উৎসাহটা এসেছিল সুমিতদার তরফ থেকে। বাবা মারা যাওয়ার দু'মাস পর সুমিতদা এসেছিল শৌর্যদের বাড়ি। তার আগে বাবার মুখে সুমিত ঘোষের নাম শুনেছিল শৌর্য। বাবা বলত, ''কলেজে সুমিত খুবই কাছের বন্ধু ছিল আমার। ছায়ার মতো অনুসরণ করত আমাকে। সিনেমা-সিরিয়াল করতে গিয়ে এমনই ব্যস্ত হল, একটা ফোন পর্যন্ত করে না এখন!''

বাবার কথায় রাগ নয়, বন্ধুর প্রতি অভিমানই প্রকাশ পেত। শৌর্যের কিন্তু রাগই হত লোকটার উপর, সুমিত ঘোষকে চিনেছিল কাগজ, টিভির ছবি থেকে। মনে হত লোকটা বাজে। বন্ধুত্বের মর্যাদা দেয় না। বিখ্যাত হয়ে ভুলে গিয়েছে পুরনো বন্ধুকে।

সুমিতদা প্রথম যেদিন বাড়িতে এল, দরজা খুলেছিল শৌর্য। দেখা মাত্র চিনেছিল সুমিত ঘোষকে। আনন্দজ করেছিল, বাবার মৃত্যুর খবর জেনে সমবেদনা জানাতে এসেছেন। দু'মাস পর সময় হয়েছে এ বাড়িতে আসার।

শৌর্যর আন্দাজ মেলেনি। সুমিতদা হাসিমুখে বলেছিল, ''তুমি নিশ্চয়ই শঙ্খর ছেলে। বাবা আছে বাড়িতে?''

''ভিতরে আসুন,'' বলে সুমিতদাকে ঘরে ডেকে নিয়েছিল শৌর্য। কে এল, জানার জন্য বসার ঘরে এসে দাঁড়িয়ে ছিল মা। মা, সুমিতদা পরস্পরের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকল খানিকক্ষণ। মায়ের চেহারায় বদল বলতে, সিঁথিতে সিঁদুর নেই। সেটা যে খুব মোটা করে পরত, তা নয়। তবু বাবা যে আর নেই সেই শূন্যতাটা গোটা শরীরকে গ্রাস করেছিল।

নীরবতা ভেঙেছিল মা। বলেছিল, ''বোসো সুমিত।''

সোফাটার দিকে তাকিয়েছিল সুমিতদা। বসেনি। দেওয়ালে বাবার ফোটোর উপর দৃষ্টি রেখে জিজ্ঞেস করেছিল, ''কবে? কী হয়েছিল?''

''মাসদুয়েক হল, রোড অ্যাক্সিডেন্ট,'' বলেছিল মা।

সুমিতদা আর দাঁড়ায়নি। ঘর থেকে সোজা বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিল। শৌর্য মাকে জিজ্ঞেস করেছিল, ''কী ব্যাপার। এ ভাবে চলে গেলেন কেন?''

মা বলেছিল, ''তোর বাবাকে বড্ড ভালবাসত। খবরটা সহ্য করতে পারল না। তবে খুব তাড়াতাড়িই আবার আসবে। দেখে নিস।''

মায়ের অনুমান পুরোপুরি মিলে গেল। দু'দিন বাদেই রাতের দিক করে শৌর্যদের বাড়ি এল সুমিতদা। সেদিন একেবারে অন্য মুড। হাসিখুশি, উচ্ছল। খুব তাড়াতাড়ি আলাপ জমিয়ে নিল শৌর্যর সঙ্গে। বাবার কলেজ জীবনের গল্প শোনালো। বাবা-মায়ের প্রেমের ঘটনাও বাদ রাখল না। মা দু'তিন বার থামানোর চেষ্টা করল। তারপর উঠে চলে গিয়েছিল লজ্জায়। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে সেদিনই মাকে একটু হাসিখুশি দেখাচ্ছিল। হঠাৎ এতবছর পর শৌর্যদের বাড়িতে আগমনের কারণ হিসেবে সুমিতদা যা জানিয়েছিল, একটা চ্যানেল থেকে টেলিফিল্মের বরাত পেয়েছে। সেটার জন্য বেছেছে বাবার লেখা একটা গল্প। গল্পটা কোথাও ছাপা হয়েছে কি না, জানে না সুমিতদা। বাবা পড়ে শুনিয়েছিল। গল্পের নামটাও মনে নেই। স্টোরিলাইনটা কিন্তু ভোলেনি। মা আর শৌর্যকে গল্পের সারাংশটা শোনাল সুমিতদা। বাবার গোটাচারেক গল্প শৌর্য পড়েছে, তার মধ্যে ওই গল্পটা ছিল না। মাও গল্পটা পড়েনি। এদিকে নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে গল্পটা অসাধারণ! মা বলেছিল, ''তুমি শিওর, এটা শঙ্খর লেখা গল্প? অন্য কারও গল্পের সঙ্গে গুলোচ্ছ না তো?''

''না রে বাবা, গল্পে যে কাঠচাঁপা গাছটার কথা আছে, ওরকমই একটা গাছ ওদের মানকুণ্ডুর বাড়িতে ছিল না? গেটের পাশে?'' মাকে মনে করিয়েছিল সুমিতদা। গাছটার কথা মনে পড়েছিল মায়ের। যদিও মানকুণ্ডুর বাড়িতে বেশিবার যায়নি। যাদবপুরেরর বাড়িতেই সংসার পেতেছিল। বাবা-মা। মানকুণ্ডুর স্মৃতি শৌর্যর কাছেও ঝাপসা। ঠাকুরদা-ঠাকুমা যখন মারা গিয়েছেন, শৌর্য খুবই ছোট। ওঁরা দু'জন চলে যেতেই ওবাড়ি বিক্রি করে দেওয়া হয়।

সুমিতদার যুক্তিতে মা মেনে নিয়েছিল গল্পটা বাবারই লেখা। বলেছিল, ''আমায় কেন পড়ায়নি বলো তো? এত ভাল গল্প!''

সুমিতদা বলেছিল, ''তুমি তো জানো ও কেমন চাপা প্রকৃতির ছেলে ছিল। কেন পড়ায়নি বোঝা খুব মুশকিল। হয়তো আমাকেই শুধু পড়িয়েছিল। গল্পের শেষের দিকে এসে কেঁদে ফেলেছিল। সেই কান্নাটা কাঁদতে চায়নি তোমার সামনে, লজ্জা পেয়েছে। কোথাও ছাপতে দিয়েছিল বলেও তো মনে হচ্ছে না। ছাপা হলে নিশ্চয়ই তোমাকে পড়তে দিত। তখন তো আর সামনে বসে কাঁদতে হত না।''

মা বলল, ''গল্পটা যখন তোমার মনে আছে, স্ক্রিপ্ট লিখে করে ফেলো টেলিফিল্ম। একটু এদিকওদিক হয়তো হবে।''

প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ উড়িয়ে দিয়েছিল সুমিতদা। বলেছিল, ''গল্পটা শোনার পরমুহূর্তে আমি শঙ্খকে বলেছিলাম যদি কোনওদিন সুযোগ পাই, এই গল্পটা থেকে সিনেমা করব। এতদিনে সুযোগটা পেলাম। চ্যানেল বলেছে আমার পছন্দের গল্প বেছে নিতে। শঙ্খর গল্পটা নিয়ে টেলিফিল্ম করব, ও দেখতে পাবে না, কিছুতেই মানতে পারছি না এটা!''

মা এ ব্যাপারে আর জোর করেনি সুমিতদাকে। সেদিন সুমিতদা চলে যাওয়ার পর মা আর শৌর্য তন্নতন্ন করে খুঁজেছিল বাবার সেই গল্প। কোনও পত্রিকায় ছাপা অবস্থায় কিংবা পাণ্ডুলিপি যদি পাওয়া যায়। গেল না। শৌর্য এখনও অপেক্ষা করে আছে গল্পটা ঠিক একদিন পেয়ে যাবে, যাদবপুরের বাড়ি থেকেই। বাবা এতটাই লুকিয়ে রাখতে চেয়েছে, মা-শৌর্যর নাগালের বাইরে রয়ে গিয়েছে।

যথেষ্ট ছবি তোলা হল হাতিদের। গ্রামের লোকজনও এসে দাঁড়িয়েছে দূরে আলের উপর। চোখের সামনে দেখছে তাদের ফসল খেয়ে নিচ্ছে হাতির দল। এখনও হাতি তাড়ানোয় আয়োজন শুরু করেনি ওরা। দূর থেকে পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে। গ্রামের ছেলে পার্টি হাতি তাড়াতে গেলে রাস্তার গাড়িগুলোর কী অবস্থা হবে, কে জানে!

বাইকের কাছে ফিরে এল শৌর্য। অধৈর্য হয়ে অনেকেই গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে। শৌর্যর চেয়ে একটু কমবয়সি একটা ছেলে কাছে এসে বলল, ''দাদা নিশ্চয়ই প্রফেশনাল ফোটোগ্রাফার?''

ক্যামেরা ব্যাগে ঢোকাতে-ঢোকাতে এমন ভাবে হাসে শৌর্য, যার মানে 'হ্যাঁ' অথবা 'না' দুটোই হয়। ছেলেটা মনে হয় 'হ্যাঁ' ধরে নিল। বলল, ''দাদার নামটা যদি বলেন!''

''কেন?'' অবাক হয়ে জানতে চায় শৌর্য।

ছেলেটি বলে, ''নাম ধরে ফেসবুক সার্চ করতাম। নিশ্চয়ই

এই ছবিগুলো আপনার ওয়ালে পোস্ট করবেন। আমার দেখা হয়ে যেতে।"

"এই ধরনের ফোটো আমি ওয়ালে দিই না, বিক্রি করি অথবা এগজিবিশনে পাঠাই," বলে বাইকে উঠে বসল শৌর্য।

ছেলেটা আর ঘেঁষল না, ফিরে গেল। মিথ্যে কিছু বলেনি শৌর্য। এফবির ওয়ালে ছবি দিলে বড্ড চুরি হয়ে যায়। ফোটোর নীচে নিজের নাম টাইপ করে দিলেও। ওই অংশটা ক্রপ করে নেয় ফেসবুকিয়া চোর। ফোটোগ্রাফিতে উৎসাহ দেওয়ার সময় সুমিতদা বারবার বলে দিয়েছিল, "বিনা পয়সায় একদম ছবি তুলবি না। ফোটোগ্রাফিতে বিস্তর খরচ। গলায় দামি ক্যামেরা ঝুলছে দেখলেই মেয়ের সংখ্যা বাড়বে তোর পাশে। আজকাল অবশ্য ছেলেরাও কম যায় না। টাকার শর্তে ফোটো তুলে দিবি। নয়তো আরও দামি ক্যামেরা, লেন্সের জন্য মায়ের কাছে হাত পাততে হবে।"

সুমিতদার কথা মোটামুটি মেনে চলে শৌর্য। বাবার লেখা গল্প নিয়ে কথা বলার পর কিছুদিনের তফাতে আবার বাড়িতে এসেছিল সুমিতদা। এমনিই গল্প করতে আসা, শৌর্যদের খোঁজখবর নেওয়া... মা সেদিন বলেছিল, "আজ সোমাকে সঙ্গে আনতে পারতে। অনেকদিন দেখিনি।"

"আমিও দেখিনি অপর্ণা। বছরচারেক হল মেয়েকে বগলদাবা করে আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে।"

"সে কী! কেন? আমরা তো কোনও খবর পাইনি! শঙ্খ কি জানত?" জিজ্ঞেস করেছিল মা।

সুমিতদা বলেছিল, "কারও কাছ থেকে জেনেছে কি না, জানি না। আমি বলিনি। ইনফ্যাক্ট ওই কারণেই আমি শঙ্খর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলাম না। তুমি তো জানো শঙ্খ কতটা পিউরিটান মনোভাবের। কিছুতেই আমাদের ডিভোর্স হতে দিত না। চোটপাট করত আমার উপর। কিন্তু সম্পর্ক তো একজনের দোষে ভাঙে না, অপরজনও দায়ী থাকে, কম অথবা বেশি।"

"তা হলে কি আবার বিয়ে করেছ?" জানতে চেয়েছিল মা। সুমিতদা বলল, "না, একটি মেয়ের সঙ্গে লিভ ইন করছি।"

"লিভ ইন কেন? মেয়েটি কি বিয়েতে রাজি নয়?" প্রশ্ন করেছিল মা।

উত্তর দেওয়ার আগে শৌর্যর দিকে তাকিয়ে ছিল সুমিতদা। বন্ধুর কলেজপড়ুয়া ছেলের সামনে বড়দের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে বাধছিল বোধ হয়। অস্বস্তি কাটিয়ে মাকে বলেছিল, "ঝুলন বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছে। আমিই রাজি হচ্ছি না।"

"কেন?" অবাক হয়ে জানতে চাইল মা।

সুমিতদা বলেছিল, "বিয়েটা করে ফেললেই আমার মেয়েটা পর হয়ে যাবে। আর আমাকে বাবা বলে মনে করবে না।"

কথাটা শুনেই বোঝা গিয়েছিল সুমিতদা কতটা সেনসিটিভ মানুষ। আবার এটাও তো ঠিক, যার সঙ্গে লিভ ইন করছে, তাকে স্ত্রী-র মর্যাদাটা না দিতে চাওয়াটাও অন্যায়। এ ক্ষেত্রে নিজের রক্তের সম্পর্কের প্রতি পক্ষপাত দৃষ্ট হয়ে পড়ছে। এদিকে বাবাকে বলছে পিউরিটান। নিজেও তো কিছু কম যায় না। অস্বস্তিকর প্রসঙ্গ এড়াতে চেয়ে সুমিতদা শৌর্যর দিকে মন দিয়েছিল। বলেছিল, "বাবা তো গল্প-কবিতা লিখত। তোর এরকম কোনও আর্টিস্টিক শখ আছে নাকি?"

দৃষ্টি নীচে রেখে মাথা নেড়ে 'না' বুঝিয়েছিল শৌর্য। মা বলল, "না গো সুমিত, ও খুব ভাল ছবি তোলে। আমরা বেড়াতে গেলে প্রচুর ফোটো তুলত। ছবিগুলো ভাল হচ্ছে দেখে শঙ্খ ওকে দামি ক্যামেরা কিনে দিয়েছে। এখন তো সেই ক্যামেরা নিয়ে একা-একাই বেরিয়ে যায় ছবি তুলতে।"

মায়ের কথা শেষ হতেই সুমিতদা বলেছিল, "যা, ফোটোগুলো নিয়ে আয় দেখি।"

বেছে-বেছে কিছু ফোটো নিয়ে এসেছিল শৌর্য। সেগুলো দেখতে-দেখতে স্বতঃস্ফূর্ত বিস্ময় ফুটে উঠেছিল সুমিতদার মুখে। বলেছিল, "তুই তো দারুণ ছবি তুলিস! এই বয়সে এত সুন্দর কমপোজিশন, অ্যাঙ্গল, পারস্পেকটিভ... এত সব শিখলি কার থেকে?"

"বাবা খানিকটা দেখিয়ে দিয়েছে, আর ফোটোগ্রাফি সাইটের ছবিগুলো দেখি নেটে," বলেছিল শৌর্য।

সুমিতদার মন্তব্য ছিল, "তোর বাবার তো ফোটোগ্রাফি সেন্স থাকবেই। অ্যাড এজেন্সিতে চাকরি করত। তোকে ফোটোগ্রাফির প্রাইমারি বিষয়গুলো ধরিয়ে দিয়েছে। তবু আমি বলব কলেজের পাশাপাশি কোনও ফোটোগ্রাফি শেখার ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হয়ে যা। সাবজেক্টটা হাতেকলমে শেখ। তোর মধ্যে বড় ফোটোগ্রাফার হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।"

সুমিতদার কথায় মা-ও খানিকটা উৎসাহ পেয়েছিল। তবে একথাও শৌর্যকে বলেছিল, "দেখিস, ফোটোগ্রাফিটাকে প্রফেশন করে ফেলিস না যেন। হাতে গোনা দু'একজনকে ছাড়া ফোটোগ্রাফারদের লোকে তেমন পাত্তা দেয় না।"

শৌর্য বলেছিল, "আগে তো কাজটা ভাল করে শিখি। নামী ফোটোগ্রাফার হওয়া অনেক দূরের ব্যাপার।"

দমদমের একটা ইনস্টিটিউশনে অ্যাডমিশন নিল শৌর্য। মা প্রয়োজন মতো অ্যাক্সেসরিজ় কিনে দিতে থাকল। শৌর্য তখন দেদার ছবি তুলে যাচ্ছে। স্টিটফোটো, ল্যান্ডস্কেপ, চেনা পরিচিতদের পোর্ট্রেট, বিয়েবাড়ি... সুমিতদা কয়েকমাস বাদ দিয়ে এসেছিল বাড়িতে। সেদিন লিভ ইন পার্টনার ঝুলনদিকে এনেছিল। আলাপ করাল মায়ের সঙ্গে। শৌর্যর তোলা ফোটো দেখতে চাইল। ছবি দেখে ভীষণ খুশি। বলেছিল, "তুই তো আরও উন্নতি করেছিস। পোর্ট্রেট তুলছিস দারুণ। তোকে আমার কাজে লাগবে।"

কাজে লাগাতে সময় লাগল প্রায় এক বছর। হঠাৎ একদিন সুমিতদার ফোন, "আমার ছবিতে স্টিল ফোটোগ্রাফি করতে হবে তোকে। আজকালের মধ্যে দেখা কর।"

সিনেমায় স্টিল ফোটোগ্রাফারের কাজটা ঠিক কী, জানত না শৌর্য। স্টিল ফোটোগ্রাফারের নাম থাকে টাইটেল কার্ডে, সেটা দেখেছে। সুমিতদার কাছে গিয়ে জানা গেল কাজের ধরন। ছবির পাবলিসিটির জন্য স্টিল ফোটোর দরকার তো আছেই। আর আছে কন্টিনিউটি মেনটেনের প্রয়োজনে ছবি তোলা। যেমন, আজ কোনও সিনের শুটিং হল অর্ধেকটা, তিনদিন পর বাকিটা হবে। প্রথম অংশের সেট-সেটিং, অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাজপোশাকের যে ছবি তুলে রাখবে স্টিল ফোটোগ্রাফার, দ্বিতীয় অংশের শুটিংয়ের আগে সেসব মিলিয়ে নিতে হবে। যেন মনে না হয়, দুটো আলাদা দিনে শুট করা হয়েছে।

গোটা ব্যাপারটা বুঝে নেওয়ার পর শৌর্য সুমিতদাকে বলেছিল, "আমার কলেজের কী হবে! অ্যাবসেন্ট হয়ে যাব তো।"

"ছাড় তো কলেজ! কত বিখ্যাত লোক কলেজে নাম লিখিয়ে রেখে নিজের কেরিয়ার গড়েছে, পরীক্ষা দিয়ে পাসও করেছে সময়মতো," বলেছিল সুমিতদা। আর তখনই সেই কথাটা বলেছিল, "বিনা পয়সায় কখনওই ফোটো তুলবি না।

ফোটোগ্রাফিতে বিস্তর খরচ। সেটা নিজেকেই তুলতে হবে। তবেই প্রফেশনাল হতে পারবি।'' ভাবনায় সুমিতদার প্রসঙ্গ এভাবে এসে পড়াতে, মানুষটার জন্য চিন্তা হতে থাকে শৌর্যর। সময়মতো পৌঁছতে না পারলে লুকটেস্ট ক্যানসেল হয়ে যাবে। কেটে যাবে প্রোডিউসর। কিন্তু হাতি রাস্তা জুড়ে থাকলে শৌর্য কী করে এগোবে? সুমিতদা-কে একটা ফোন করবে কি? বলবে রাস্তার পরিস্থিতি। সুমিতদা অন্য কোনও ফোটোগ্রাফারকে ডেকে নিতে পারবে।

টুটুঙ্গারস থেকে ফোন বের করতে গিয়ে থমকায় শৌর্য। হাতির পাল অনেকটাই নেমে গিয়েছে চাষের জমিতে। ফাঁকা হয়েছে ফালিমতো রাস্তা। বাইক বেরিয়ে যাবে। রিস্ক নেওয়া হয়ে যাবে কি? কোনও বাইকই যাচ্ছে বা আসছে না। চেহারা বড় হলে কী হবে, হাতিরা খুবই ক্ষিপ্র। কখন কী করবে ঠিক নেই। পিছন দিকে ঘাড় ফেরায় শৌর্য, যেহেতু রাস্তার ধারে আছে, পিছনে গাড়ি নেই। বাইক ব্যাক করিয়ে রাস্তার আরও ধার ধরে বেরিয়ে যেতে পারবে। হাতিরা ঘুরে পথ না আটকালেই হল। দুরন্ত গতিতে পেরিয়ে যেতে হবে ওদের করিডর। হেলমেট পরে নেয় শৌর্য, প্রায় অজান্তে কিক মারে বাইকে। আওয়াজ উঠতেই আশপাশের সবাই সভয়ে তাকাল শৌর্যর দিকে। পাত্তা না দিয়ে শৌর্য বাইক ব্যাক করাতে থাকে। একটা গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন বছর তিরিশেকের এক মহিলা। পরনে আধুনিক পোশাক। শৌর্যর কাছে এসে ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললেন, ''আপনি কি ওদের ক্রস করবেন?''

হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ে শৌর্য। মহিলা জিজ্ঞেস করেন, ''আপনি কতদূর যাবেন?''

''কলকাতা,'' বলল শৌর্য।

মহিলা বললেন, ''প্লিজ, আমাকে লিফ্‌ট দিন। না হলে ফ্লাইট মিস করব আমি।''

''হাতিদের পাশ দিয়ে যেতে আপনার ভয় করবে না?'' মহিলাকে নিরস্ত করার জন্য বলল শৌর্য।

''তা করবে। কিন্তু ফ্লাইটটা যে আমায় ধরতেই হবে। ভীষণ আর্জেন্ট। কোম্পানির অনেক টাকা লস হয়ে যাবে।''

মহিলার কথা শেষ হতেই বাইকের অন্য পাশে এসে দাঁড়ালেন বছর পঞ্চান্নর এক ভদ্রলোক। বোঝাই যাচ্ছে গ্রামে বসবাস, গালে খোঁচা-খোঁচা সাদা কালো দাড়ি। বলতে থাকলেন, ''আমার মেয়েটাকে কলকাতায় পৌঁছে দেবে বাবা? চাকরির পরীক্ষা। লিখিত পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে, আজ ইন্টারভিউ।''

শৌর্য পড়ল মহাবিপদে। দু'জনকে একসঙ্গে নেওয়া যাবে না। আনস্টেডি হয়ে যাবে বাইক। মহিলার সঙ্গে আবার একটা লাগেজও আছে। বাবার পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে গ্রামের মেয়েটা। সালোয়ার-কামিজ, পিঠে ব্যাগ। মুখে আর্তি-মেশানো গভীর উৎকণ্ঠা। শৌর্য মেয়েটির বাবাকে জিজ্ঞেস করে, ''আপনাদের গাড়ি কোথায়?''

''গাড়ি নয় বাবা, বাস,'' বলে লোকটি আঙুল তুলে সবচেয়ে পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা বাসটিকে দেখালেন। শৌর্য লোকটিকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে দেখে আধুনিকা আগ্রাসী ভূমিকা নিলেন, বাইকের সিটে উঠে আসার উদ্যোগ নিয়ে বলতে থাকলেন, ''প্লিজ, ব্রাদার ইটস সো আর্জেন্ট। লেটস্ গো।''

''দাঁড়ান, দাঁড়ান... আপনার হেলমেট আছে? আমার স্পেয়ার নেই, একটু বাদেই আটকাবে পুলিশ!'' বলল শৌর্য।

থমকে গেলেন মহিলা। গ্রামের মেয়েটি প্রায় দৌড়ে এসে উঠে পড়ল বাইকে। শৌর্য তাকেও বলল, ''হেলমেট?''

''কিনে নেব রাস্তায়। এখন তো চলুন।''

শৌর্য বুঝল মেয়েটার চাকরি হওয়া কেউ ঠেকাতে পারবে না। উপস্থিত বুদ্ধি দারুণ! বাইক আরও খানিকটা পিছিয়ে নিতে-নিতে শৌর্য আধুনিকাকে বলল, ''সরি ম্যাম, আপনার কোম্পানির লসের চেয়েও মেয়েটার চাকরি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।''

''হাউ ড় ইউ নো দ্যাট শি ইজ টেলিং ট্রুথ?'' চেঁচিয়ে বলে উঠলেন মহিলা। কথাটা কানে নিয়েই রাস্তার ধার ঘেঁষে বাইক ছোটাল শৌর্য। মেয়েটিকে বলল, ''আমার কাঁধটা ভাল করে চেপে ধরো। নড়াচড়া করবে না। হাত কেঁপে যাবে আমার।''

মেয়েটা কোনও উত্তর করল না। কাঁধটা ধরল চেপে। শৌর্য ফের বলে, ''স্টেডি থাকো। তেমন বুঝলে চোখ বন্ধ করে নাও।''

এবার মেয়েটি বলে ওঠে, ''আপনিই দেখছি বেশি ভয় পাচ্ছেন। কী হবে, বড়জোর সহমরণে যাব।''

নিজের কথায় নিজেই হাসছে মেয়েটা। গ্রামের হলে কী হবে, বেশ ফিচেল আছে। পিছনে একজনকে নেওয়াতে ভয় একটু হচ্ছিলই শৌর্যর। সহযাত্রীর ইয়ার্কিতে সেটা কেটে গেল। সজোরে এগিয়ে চলল হাতিদের ছেড়ে যাওয়া ওই একফালি রাস্তা লক্ষ্য করে।

● ৩ ●

আয়নার কাঠের ফ্রেমে বেশ ক'টা সোয়েডের টিপ। সব চেয়ে নতুনটা তুলে নিল আরশি। হতে পারে এটা লাস্ট বোর্ডারের টিপ। সঙ্গে নিশ্চয়ই কোনও পুরুষ ছিল। কুমারী মেয়েরা সাধারণত এরকম লাল টিপ পরে না। পুরুষ সঙ্গীটির সঙ্গে মেয়েটির স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ধরে নিয়ে রিসেপশনের লোকটা এদের রুম দিয়েছিল। আরশি একা বলে কিছুতেই দিতে চায়নি। তখন আরশি বলেছিল, ''আমি কি একটা পুরুষ মানুষ ভাড়া করে নিয়ে আসব? বলব, 'এ আমার হাজ়ব্যান্ড'। তা হলে দেবেন তো রুম?''

রিসেপশনের লোকটা মাথা নিচু করে বসেছিল। আরশি ফের বলে, ''আর হ্যাঁ, শুধু পুরুষ মানুষ ভাড়া করলে হবে না। সিঁদুর, টিপ, শাঁখা-পলা, নোয়া সব লাগবে। ব্যাস্, তা হলেই প্রবলেম সল্‌ভড। পেয়ে যাব রুম। ঝুটো জিনিসপত্র দিয়ে ঘর পাওয়া যায়। সত্যি বললে রিফিউজ! অদ্ভুত ব্যাপার!''

লোকটা তখন বলেছিল, ''কাপলকে দেখে সন্দেহ হলে আমরা ম্যারেজ সার্টিফিকেট দেখতে চাই।''

এটা জানা ছিল না আরশির। তথ্যটা হজম করে নিয়ে বলেছিল, ''সন্দেহ হলে তবে তো সার্টিফিকেট দেখার প্রশ্ন আসছে। এমন অ্যাক্টিং করবে আপনারা বুঝতেই পারবেন না। অথবা বুঝেও কিছু বলবেন না। আপনাদের ব্যবসা দরকার। একটা রুম তো বুক হল। আই কার্ডের জেরক্স রেখে দেবেন। কাউটা নকল কি না, সেটাও খতিয়ে দেখবেন না। আর আমি অরিজিনাল আই কার্ড দিচ্ছি, কী কাজে এসেছি, বলেছি সেটাও। আপনি ভেরিফাই করে দেখতে পারেন সত্যি বলেছি কি না। সে সব না করে প্রথমেই বলে দিচ্ছেন একা মেয়েকে রুম দেবেন না। কোন যুগে পড়ে আছেন আপনি? মেয়েরা এখন সেল্‌ফ ডিপেনডেন্ট। একা-একা কত কাজ করে বাইরের।''

রিসেপশনিস্ট তখনও চুপ। আসলে লোকটা একটু নিরীহ টাইপের। তেমন চালাক চতুর নয়। এই হোটেলে আসার আগে দু'টো জায়গায় প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল আরশি। তারা বলেছে, রুম

নেই। অর্থাৎ কিছু বলারও রইল না। এই হোটেলের লোকটি বলে বসল, "আমরা কোনও ইয়ং সিঙ্গল লেডিকে রুম দিই না।"

বাস, তারপরই চেপে ধরার সুযোগ পেয়েছিল আরশি। লোকটা উত্তর দিতে পারছিল না। শেষে বলল, "আপনি থানা থেকে পারমিশন করিয়ে আসুন।"

"আমি কেন থানায় যাব! আইনে সেরকম কিছু লেখা আছে নাকি? লেখা থাকলে দেখান," বলেছিল আরশি।

লোকটা আবারও চুপ। আরশি তখন বলে, "আচ্ছা, অনেক ধর্ম বা জাতিতে শাঁখা-সিঁদুর নেই। সেসব কাপলদের ক্ষেত্রে কী করেন? ম্যারেজ সার্টিফিকেট দেখতে চান? এটা তো উচিত নয়। হিন্দুদের বেলায় ছাড় আর তাদের বেলায় সন্দেহ?"

লোকটার তখন পুরো নাজেহাল অবস্থা। শেষমেশ বলে উঠেছিল, "দেখুন ম্যাডাম, আপনাকে তা হলে আসল ঘটনাটা বলি। এক বছরও হয়নি, আপনার বয়সি একটি মেয়েকে আমরা রুম দিয়েছিলাম। সকালে দরজা খুলছে না দেখে ভেঙে ঢুকতে হয়। গলায় ওড়না জড়িয়ে সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলছিল।"

কথাটা শুনে ভিতরটা একেবারে হি হি করে কেঁপে উঠেছিল আরশির, বাইরে সেটা প্রকাশ হতে দেয়নি। লোকটাকে বলেছিল, "ঠিক আছে, আমাকে দিনের বেলাটার জন্য একটা রুম দিন। কাজের জায়গায় গিয়ে দেখি কোনও ব্যবস্থা করা যায় কি না।"

"দেখি নয়, রাতের ব্যবস্থা আপনাকে করে নিতেই হবে, বুঝতেই পারছেন... আমি কর্মচারী, মালিক আমাকে যেমন ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে, সেটাই মেনে চলতে হবে," বলে হোটেলের রেজিস্টার খাতা এগিয়ে দিয়েছিল লোকটা। আরশির ভোটার কার্ড দেখে, ওখানেই স্ক্যান করে ফেরত দিল। তারপর সার্ভিস বয়কে ডেকে রুমের চাবি যখন দিতে যাচ্ছে, আরশি বলেছিল, "ওই ঘরটার চাবি দিচ্ছেন না তো?"

হেসে মাথা নেড়েছিল লোকটা। বলেছিল, "সুইসাইডের ঘর মালিক বন্ধই রেখেছে। মনে করে অপয়া। আপনার মনেও তা হলে ভয়ডর আছে দেখছি। যে ভাবে আর্গুমেন্ট করছিলেন, আমি ভাবছিলাম আপনি এসবের ঊর্ধ্বে।"

হোটেলে ওঠার কারণ হিসেবে আরশি রিসেপশনিস্টকে বলেছে, অফিসের কাজে এসেছে। বন্ধুর বাড়িতে ওঠার কথা ছিল, বন্ধুর মা হাসপাতালে অ্যাডমিটেড জেনে ওখানে আর যায়নি। অর্থাৎ অর্ধসত্য বলেছে। তাতে সুবিধে কিছু হয়নি। প্রায় জোর করে ঘর নিতে হল। তাও দিনের বেলাটুকুর জন্য।

ট্যাক্সি ড্রাইভার লোকটি ভাল। অন্যের ব্যাপারে নাক গলায় না। শিয়ালদা থেকে আসার পথে শুনেছে বাবাকে মিথ্যে বলছে আরশি। তবু গোলপার্কে এসে একটা হোটেলের সামনেই দাঁড় করিয়েছিল গাড়ি। আরশি বলেছিল, "একটু ওয়েট করুন। রুম পাই কি না দেখি। না পেলে অন্য হোটেলে যেতে হবে।"

দ্বিতীয় হোটেলে রিফিউজ্‌ড হওয়ার পর ড্রাইভার বলেছিল, "আর-একটা হোটেলে নিয়ে যাচ্ছি, তারপর আমায় ছেড়ে দেবেন।"

ট্যাক্সি ছেড়ে দেওয়ার পর আরশির রোখ চেপে গিয়েছিল, এই হোটেলে জায়গা তাকে পেতেই হবে। দুপুর দুটোয় অ্যাপয়েন্টমেন্ট, পাঁচঘণ্টা এখন কোথায় ঘুরবে সে? আর যে কাজে যাবে, সেখানে ফ্রেশ হয়ে ঘণ্টা দু'তিনেক রেস্ট নিয়ে যাওয়া উচিত। নয়তো আরশিকে দেখামাত্র বাতিল করে দেবে ওরা।

রুমে ঢুকেই বাবাকে ফোন করেছিল আরশি। বলেছে, "চলে এসেছি পূর্বাদের বাড়িতে। এবার স্নান করতে ঢুকব। রাতে ফোন করব আবার।"

"ঠিক আছে, আজকে আর কোথাও বেরস না, রেস্ট নে..." বলে ফোন কেটেছিল বাবা।

আরশির খারাপ লাগছে বাবাকে এভাবে মিথ্যে বলতে। আগে কখনও এত বড় ধরনের মিথ্যে বলতে হয়নি। আরশি যে এরকম মারাত্মক ঝুঁকি নিয়েছে, বাবা যখন জানবে, আরশিই বলবে, প্রথমে তো বিশ্বাসই করবে না। বিশ্বাস হওয়ার পর বাবা অভিমান করবে খুব! অসুস্থ হয়ে পড়ারও আশঙ্কা আছে। আরশির নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না, তার মতো শান্ত এবং ভিতু প্রকৃতির মেয়ে, যে মেয়ে জ্ঞান হওয়ার পর থেকে কলকাতায় কখনও আসেনি, সে কলকাতা শহরে এসে একা একটা হোটেলে উঠেছে! অবশ্য ঝুঁকিটা সে যেচে নেয়নি, পরিস্থিতি বাধ্য করেছে।

হাতের লালটিপটা কপালের মাঝে বসায় আরশি। অন্যের টিপ পরতে অস্বস্তি হচ্ছিল। তবু একবার দেখে নিল তাকে মায়ের মতো দেখতে লাগছে কি না। আয়না বলছে, লাগছে না। ঠিকই বলছে। সকলেই বলে আরশি পিতৃমুখী। আরশিও এ ব্যাপারে নিশ্চিত। মায়ের ছবির সঙ্গে নিজের মুখ মিলিয়ে দেখেছে, কোনও মিল নেই। যে কাজে এসেছে, তাতে মায়ের মুখের সঙ্গে মিল থাকা একেবারেই চলবে না। তাই টিপটা পরে আরও একবার নিশ্চিত হয়ে নিল।

সোয়েডের টিপটা যথাস্থানে সাঁটিয়ে আরশি এগোল জানলার দিকে। হোটেলটা মেন রোডের ধারে। আরশির ঘর তিনতলায়। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে রাস্তার লোক চলাচল। যানবাহন। এখানেও ওয়ানওয়ে রাস্তা। দু' রাস্তার মাঝে বড়-বড় গাছ। সামনের গাছটার মাথা জানলার সমান-সমান। বেশ ক'টা পাখি গাছের ডাল বদল করছে। কিছুক্ষণ আগেও খানিক দূর থেকে কোকিলের ডাক ভেসে আসছিল। বাড়ির জন্য মন খারাপ করছিল আরশির। বছরের এই সময়ে তাদের জলপাইগুড়ির বাতাস কেঁপে ওঠে ঘন-ঘন কোকিলের ডাকে। লজ্জায় রাঙা হতে থাকে শিমুল-পলাশ। এসব কলকাতায় পাওয়া যাবে না বলেই ধরে নিয়েছিল আরশি। লোকমুখে শুনে, কাগজ-টিভি দেখে ধারণা হয়েছিল কলকাতা একেবারেই শুকনো জায়গা। মা এখানে এসে হারিয়ে গিয়েছে বলে শহরটাকে নির্দয়ও মনে হত। কিন্তু এ শহরে পা রাখার পর থেকে তেমনটা আর মনে হচ্ছে না। বিশেষ করে এই গোলপার্ক এলাকাটাকে তো জলপাইগুড়ির বড়লোক আত্মীয় মনে হচ্ছে। তবে উপর-উপর দেখা আর ভিতরে গিয়ে বোঝার মধ্যে বিস্তর ফারাক। আজ দুপুর দুটোয় গোলপার্কের ভিতরে প্রবেশ করবে আরশি। তারপর দেখা যাক যে কাজে এসেছে, সফল হয় কি না।

জানলার নীচে ফুটপাথের দিকে চোখ যায় আরশির। স্কুলড্রেস পরা বাচ্চা ছেলের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে ঘাঘরা-কুর্তি পরা এক মহিলা। সম্ভ্রান্ত চেহারা দেখে আন্দাজ করা যায় বাচ্চাটির মা। স্কুলের পুলকারের অপেক্ষায় রয়েছে দু'জন। আরশির মনে পড়ে না তার মা তাকে কখনও স্কুলের গাড়িতে উঠিয়েছে কি না। ওঠানোর তো কথা। আরশি যখন কেজি পার করে ক্লাস ওয়ান, মা বাড়ি ছাড়ে। মায়ের আবছা কিছু স্মৃতি আরশির মনে ধরা আছে। যার মধ্যে স্কুলের বাসে তুলে দেওয়ার ছবি নেই। যেটুকু স্মৃতি আছে মায়ের, সেগুলোকেও আজকাল আর বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। সন্দেহ হয়, এগুলো বুঝি নিজেরই মনগড়া।

মা না থাকাটা চেহারার কোনও খুঁতের মতোই মানিয়ে নিয়েছিল আরশি। যেমন, কারও-কারও মুখে হাতে বেমানান

ভাবে তিল-জড়ুল থাকে। আত্মীয় পরিজনের "আহা রে, বাছা রে" শোনাও অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। মায়ের চরিত্র নিয়ে বিদ্রুপও কম শুনতে হয়নি। এখন অবশ্য মায়ের কথা আর কেউ তেমন তোলে না। সময় জলপাইগুড়ির বাতাস থেকে মুছে দিয়েছে মায়ের সমস্ত অস্তিত্ব। অল্প কিছু পড়ে আছে আরশিদের বাবুপাড়ার বাড়িতে। কয়েকটা ছবি, মায়ের পোশাকআসাক, হাতের লেখা, রেকর্ডারে গান-কবিতা। রাগে সবই ফেলে দিতে পারত বাবা। ফেলেনি। ভালবাসা থেকে নয় কিন্তু। আরশি একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, "মায়ের এই জিনিসগুলো আগলে রেখে কী লাভ? যখন মামাদের ভুলে যেতে পেরেছে মা। আমরাই বা এসব রাখব কেন?"

বাবা বলেছিল, "তুই যদি বলিস, ফেলে দেব। তোর জন্যই রেখেছি। উত্তরাধিকার সূত্রে এগুলো তো তোরও জিনিস।"

কী ভেবে বাবাকে আর মায়ের স্মৃতিগুলো ফেলতে বলেনি আরশি। ওই স্মৃতিগুলোয় প্রাণ সঞ্চারিত করল বাড়ির ল্যান্ডফোনের রিং। বাবা সেদিন অফিসে, আরশির কলেজ ছুটি। দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর ল্যাপটপে সিনেমা দেখছিল। বেজে যাচ্ছ ল্যান্ডফোন। ধরতে ইচ্ছে করে না, তুললেই ইনিয়োরেন্স গছানোর চেষ্টা করবে কলসেন্টার। পরিচিত জনের ফোন আজকাল ল্যাণ্ডলাইনে প্রায় আসেই না। সবাই মোবাইলেই করে। রিং কেটে গিয়ে আবার যখন বাজা শুরু হল, সিনেমায় পঞ্জ দিয়ে

ফোন ধরতে উঠেছিল আরশি। রিসিভার কানে নিয়ে "হ্যালো, হ্যালো" করে যাচ্ছ, ও প্রান্তে কোনও সাড়া নেই। ফোন কাটতে যাবে আরশি, ভেসে এল "ঝুমু বলছিস?" গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল আরশির। ভাঙাচোরা, হাহাকার মেশানো এই মহিলাকণ্ঠ কার? আরশির ডাকনাম ধরে ডাকলেন। যদিও এই নাম মামার বাড়িতেই চলত বেশি। প্রশ্নকর্ত্রীকে পালটা প্রশ্ন করেছিল আরশি, "কে বলছেন আপনি? কোথা থেকে বলছেন?"

আবারও কোনও সাড়া নেই। আরশি আরও কয়েকবার একই প্রশ্ন করে। এক সময় কেটে যায় লাইন। আরশির কপালে ভাঁজ পড়েছিল। মা-ও 'ঝুমু' বলে ডাকত। 'আরশি' নামটা বাবার দেওয়া। চিরকালই ওই নামেই ডাকে। কাকা, জ্যাঠা, পিসিরাও তাই। মায়ের বাবুপাড়ার বাড়িতে না ফেরাটা যখন প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল, মামাবাড়ির তরফ থেকে কেউ আর আরশিদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত না। তা হলে কে ফোন করল সেই কবেকার নাম ধরে?

নিজের বিছানায় ফিরে গিয়ে শুয়ে পড়েছিল আরশি। সিনেমাটা আর দেখতে ইচ্ছে করেনি। খালি মনে হচ্ছিল ওটা মায়ের গলা। এতদিনে হয়তো মেয়ের জন্য মন খারাপ শুরু হয়েছে। ফোন না করে পারেনি। কিছু কী বলতে চেয়েছিল মা, অপরাধবোধ থেকে পারল না বলতে? পরক্ষণেই আরশির মনে হয়েছিল, মা নয়, অন্য কেউ। কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে হেঁয়ালিমার্কা ফোন করল। দীর্ঘ ষোলো বছর পর মা হঠাৎ ফোন করতে যাবে কেন? করার হলে অনেক আগেই করত। ষোলো বছরে দুনিয়ার কত কিছু পালটে যায়। দেখা না হওয়ার এই দীর্ঘ অবসরে মায়ামমতাও ফিকে হয়ে আসে।

বাবা অফিস থেকে ফিরতেই দুপুরের কলটার কথা বলেছিল আরশি। একটু ভেবে নিয়ে বাবা জিজ্ঞেস করেছিল, "তোর কী মনে হচ্ছে, মা ফোন করেছিল?"

"শিওর নই, তবে হতেও তো পারে!" বলেছিল আরশি।

তক্ষুনি কোনও উত্তর দেয়নি বাবা। বাথরুমে ঢুকে মুখ হাত ধুয়ে, বাইরের পোশাক বদলে চা খেতে বসল আরশির সঙ্গে। সারাদিনের কাজের লোক মঙ্গলামাসি থাকলেও, সন্ধের চা-টা আরশিই করে। কেন যেন মনে হয়, তার হাতে করা চা বাবা বেশি পছন্দ করে। কাপে চুমুক দিয়ে বাবা বলেছিল, "তোর মাকে আমি যতটা চিনি, তাতে মনে হয় না ও ফোন করেছে। ভীষণ জেদি তোর মা। ভুল, ঠিক যাই হোক একবার যে সিদ্ধান্ত নেবে শোভা, তার থেকে পিছু হটবে না। তা ছাড়া মাঝে যখন এত বছর কেটে গিয়েছে, শোভার ফোন না ভাবাই ভাল।"

"তা হলে আর কার ফোন হতে পারে? বিশেষ করে ওই নামে ক'জনই বা আমাকে চেনে?" বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্নটা রেখেছিল আরশি।

বাবা বলল, "উড়োফোন কতরকমের হয়। কেউ হয়তো আমাদের সঙ্গে বদমাইশি করছে। ডিসটার্ব করতে চাইছে আমাদের।"

"মামার বাড়ির কেউ হতে পারে কি?" বাবার কাছে জানতে চেয়েছিল আরশি।

সন্দেহটা পুরোপুরি উড়িয়ে দেয়নি বাবা। বলেছিল, "জানি না। হতেও পারে। তবে কোনও উদ্দেশ্য খুঁজে পাচ্ছি না। এতদিন চুপচাপ থেকে, হঠাৎ এরকম করবে কেন? দ্যাখ, আবার এরকম কল আসে কি না। আর কালই আমি ল্যান্ডফোনে সিএলআই মেশিন লাগাব, দেখা যাবে কোন নম্বর থেকে ফোন আসছে।"

"আজকের কলটা কোন নম্বর থেকে এসেছে, ফোন অফিসকে জিজ্ঞেস করলে হয় না?" বলেছিল আরশি।

মেয়ের উৎসাহ দেখেই বাবা 'দেখছি' বলল। নিজের কোনও আগ্রহ ছিল না।

কয়েকদিনের মধ্যেই ল্যান্ডফোনের সঙ্গে সিএলআই মেশিন ইনস্টল করে দিয়ে গেল টেলিফোন অফিসের লোক। বাবা ফোন করে বলে দিয়েছিল তাদের। অফিস থেকে ফিরে বাবা জিজ্ঞেস করল, "আর ওরকম কোনও কল এসেছিল?"

আরশি বলল, "আসেনি," তারপর জানতে চেয়েছিল, "ফোন এক্সচেঞ্জে খোঁজ নিয়েছিলে, কোন নম্বর থেকে এসেছিল কলটা?"

"নিয়েছি, কলকাতার একটা পাবলিক বুথ থেকে এসেছিল," জানিয়েছিল বাবা।

আরশি বলেছিল, "মামার বাড়ি তো মালদায়। কলকাতা থেকে কে করবে ফোন? তোমার কি কোনও ভাবেই মনে হচ্ছে না, মা

করতে পারে?"

"না, মনে হচ্ছে না। তোর মাকে তো অনেক বছর ধরে দেখেছি, ওর ধরনধারণ সব জানি। মায়ের অভাব বোধ থেকেই তোর মনে হচ্ছে ওই কলটা তার। যে ওই কলটা করে তোকে ডিসটার্ব করছে, সে তোর মনের দুর্বলতার কথা জানে," বলে খেমেছিল বাবা। মুখে একটু রাগ-রাগ ভাব। মায়ের উপর রাগ?

আরশি বলেছিল, "কে আমাকে ডিসটার্ব করতে চাইবে বলো তো? আমার সঙ্গে কারও তেমন ঝগড়াঝাঁটি নেই।"

"সেটাই হয়তো কোনও একজনের সহ্য হচ্ছে না। তোকে উত্ত্যক্ত করতে চাইছে ঈর্ষা থেকে। কেন ঈর্ষা জিজ্ঞেস করিস না। ঈর্ষার নির্দিষ্ট কোনও কারণ থাকে না। যে-কোনও ব্যাপারেই একে অপরকে ঈর্ষা করতে পারে মানুষ। ওটা মানুষের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য," বলার পর আরও একটা পয়েন্ট মনে পড়ে যেতে বাবা বলেছিল, "আর হ্যাঁ, জলপাইগুড়ি কিংবা মালদা, মানে তোর মামার বাড়ির কেউ কলকাতা গিয়ে থাকলে এই কলটা করতেই পারে। কলকাতার কাউকে দিয়ে ফোনটা করানোও যেতে পারে।"

"কিন্তু আমাকে কেউ কেন এত ইম্পর্ট্যান্স দেবে? এত গুরুত্ব পাওয়ার মতো কী করেছি আমি?" বলেছিল আরশি। বাথরুমে ঢোকার আগে বাবা উত্তর দিয়েছিল, "আরও ক'বার এরকম কল আসুক, তখন দেখব কী করা যায়। এখনই এত উতলা হওয়ার কিছু নেই।"

আর ওরকম কল আসেনি। কিছুদিন যেতে বাবা ভুলে গেল ওই ফোনটার কথা। আরশি ভোলেনি। বরং তার ধারণা দৃঢ় হতে থাকল, কলটা মায়েরই ছিল। হয়তো জলপাইগুড়ির বাড়ির কথা ভীষণভাবে মনে পড়ছে মায়ের। তাই ফোন না করে পারেনি। ল্যান্ডলাইন যেহেতু মায়ের আমলের, যোগাযোগের সূত্র ছিল ওটাই। হয়তো কিছুই বলার ছিল না মায়ের। শুধু এইটুকুই জানার ইচ্ছে ছিল, আরশিরা আগের বাড়িতেই আছে কি না। মেয়ের গলা শুনে নিজেকে বেঁধে রাখতে পারেনি মা, আদরের নাম ধরে ডেকে ফেলেছে। কিন্তু ডাকটায় এত কাতরতা কেন? মা কি খুব কষ্টে আছে? এতদিনে বুঝেছে, যা করেছিল তা অন্যায়? এখন অনুশোচনায় ভুগছে? অথবা মা এমন পরিস্থিতিতে পড়েছে, এ বাড়ির সাহায্য দরকার। ফোন করেও কথাটা বলে উঠতে পারল না মা। নিজের অপরাধবোধ কণ্ঠ রোধ করে দিয়েছিল মায়ের।

এসবই সম্ভাবনার কথা। আরশি মায়ের দ্বিতীয় ফোনের প্রতীক্ষায় দিন পার করছিল। মাসদুয়েকও কাটেনি। মায়ের সঙ্গে যোগাযোগের একটা ক্ষীণ সুযোগ দেখা দিল সামনে। কলেজ শেষ। তবু সরস্বতী পুজোর দিন বন্ধুরা মিট করেছিল। কলেজ ক্যান্টিনে বসে লহমা বলল, "আমার পিসির ছেলে দীপনদা কাল ফোন করেছিল আমাকে। তোরা তো জানিস দীপনদা টিভির মেগা সিরিয়ালে কাজকর্ম করে। এখন একটা সিনেমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর হয়েছে। শুটিং শুরু হয়নি। কাস্টিং চলছে। সেকেন্ড লিড নায়িকার জন্য আমাদের বয়সি একটা মেয়ে চাই এবং সেই মেয়েটার চেহারায় মফস্সলের ছাপ থাকতে হবে। তোরা কি কেউ অডিশন দিতে চাস? দীপনদা আমাকে বলেছে, আমার চেনাজানা এমন কেউ থাকলে এবং অভিনয় করতে ইচ্ছুক হলে যেন দীপনদার মেল নম্বরে সে যেন ক'টা ফোটো পাঠায়।"

তৎক্ষণাৎ পাঁচ-ছ'টা হাত উঠে গেল। লহমা বলেছিল, "তবে মনে রাখিস সিলেক্ট কিন্তু একজনই হবে। আবার দেখা গেল তোদের মধ্যে একজনেরও হল না। দীপনদা বা ওদের টিম শুধু আমাকে তো বলেনি খোঁজ করতে, আরও অনেককেই নিশ্চয়ই বলেছে। তোরা একটা চান্স নিয়ে দেখতে পারিস।"

আরশি হাত তোলেনি। সিনেমায় অভিনয়ের কোনও ইচ্ছেই তার নেই। মা ওই নেশাতেই তাদের ছেড়ে চলে গিয়েছে। সাধারণ কৌতূহলে লহমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, "সিনেমাটার ডিরেক্টর কে? নামী কেউ?"

"সুমিত ঘোষ। নাম শুনেছিস নিশ্চয়ই। আর্ট ফিল্ম করে," বলেছিল লহমা।

কানে তালা লেগে যাওয়ার অবস্থা হয়েছিল আরশির। এই সুমিত ঘোষ লোকটার উপর তার অসম্ভব রাগ। মা এই লোকটার ছবিতে অভিনয় করতে এসেছিল কলকাতায়। আর ফেরেনি।

নামটা শোনার প্রাথমিক ধাক্কা সামলে আরশি লহমাকে বলেছিল, "আচ্ছা, আমি ফোটো পাঠাতে পারি?"

"না পাঠানোর কী আছে। আমি তো সকলকেই বললাম। তবে যা করবি, একটু তাড়াতাড়ি। ওরা হন্যে হয়ে ক্যারেক্টারের সঙ্গে মানানসই অভিনেত্রী খুঁজছে।"

লহমার বলা শেষ হতেই এষা বলেছিল, "তুই পাঠাবি না ফোটো? তোর কানেকশন তো স্ট্রং। পিসতুতো দাদা অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর।"

"ওরে গাধা। আমাকে যদি ওই ক্যারেক্টারে মানাত, দীপনদা তো ডেকে পাঠাত অডিশনের জন্য। আমাকে বছরদুয়েক আগে দেখেছে। ফেসবুকে দেখছে লেটেস্ট ছবি," বলেছিল লহমা।

আরশি তৎপর হয়ে ওঠে চান্সটা কাজে লাগানোর জন্য। সিনেমায় অভিনয়ের কথা ভেবে নয়, মায়ের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ নিতে। কোনওভাবে যদি তার ফোটো সিলেক্ট করে সুমিত ঘোষের টিম, লোকটার মুখোমুখি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকবে। আরশি সুমিত ঘোষকে জিজ্ঞেস করবে মায়ের এখনকার ঠিকানা। দেখা হওয়া মাত্র জানতে চাইলে হবে না। ঘুরিয়েফিরিয়ে কৌশল করে জানতে হবে। মা সিনেমায় অভিনয় করবে বলে তাদের ছেড়ে চলে গিয়েছে, এই তথ্য বড় হতে-হতে জেনেছিল আরশি। আরও পরে এক পারিবারিক অনুষ্ঠানে কাকিমার থেকে জেনেছিল ডিরেক্টর সুমিত ঘোষের নাম। মা ওঁর প্রথম ছবিতে নায়িকার রোল পেয়ে বাড়ি ছেড়েছিল। সেই সিনেমা অবশ্য রিলিজ করেনি। তারপর থেকে আর কোনও খোঁজ নেই মায়ের। সুমিত ঘোষের নামটা কাকিমার মুখে শোনার পর আরশি বাবাকে বলেছিল, "ওই ডিরেক্টরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল, যার ছবিতে অভিনয় করার পরই মা উধাও হয়ে গেল?"

"সুমিত ঘোষের কথা বলছিস তো? কলকাতায় গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। বললেন, ছবিতে অভিনয়ের পর তোর মা কিছুদিন ওঁর কাছে যাতায়াত করেছিল। তারপর হঠাৎই বন্ধ করে দেয়। উনিও শোভার কোনও খবর দিতে পারেনি। পুলিশও খুঁজে পেল না। এদিকে আমি যে খুঁজছি, সে খবর পেয়ে তোর মা একদিন ফোন করে রীতিমতো হুমকি দিল, 'আমাকে খোঁজার চেষ্টা করে বিপদ ডেকো না নিজের। ফল ভাল হবে না।' তারপর থেকে হাল ছেড়ে দিয়েছি।"

সুমিত ঘোষের সঙ্গে দেখা করার ঘটনাটা ছাড়া, মাকে খোঁজার জন্য যা-যা করা হয়েছে, খানিকটা বাবা, বাকিটা আত্মীয়দের কাছে আগেই শুনেছিল আরশি। সুমিত ঘোষের পর্বটা শুনে মনে হয়েছিল, বাবা প্রায় সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার সেরে এসেছে। লোকটাকে আরও চেপে ধরা উচিত ছিল। তাতেও যদি সন্ধান না পাওয়া যেত মায়ের, টালিগঞ্জের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির অন্য লোকজনের কাছে খবর নিতে পারত বাবা। না নেওয়ার একটাই কারণ হতে

পারে, সংসার ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া বউকে আর ঘরে তুলবে না। মা চলে যাওয়ার এক বছর পর থেকে আত্মীয়-বন্ধুরা বাবাকে বারবার বলেছে কোর্টে ডিভোর্সের মামলা করে নতুন করে বিয়ের প্রস্তুতি নিতে। আরশিকে তো মানুষ করতে হবে। এ সবই আরশি শুনেছে বড় হয়ে। বাবা ডিভোর্স এবং আবার বিয়ের দিকে পা বাড়ায়নি। বলেছে, ''নতুন বউ এসে স্বাভাবিক চাহিদা থেকেই নিজের একটা ইসু চাইবে। তখন আরশির অযত্ন হবে। তার চেয়ে টাকা দিয়ে আরশির জন্য লোক রাখা ভাল। অযত্ন হলে জবাবদিহি করতে পারব।''

বাবা বিয়ে না করাতে আরশি যেমন স্বস্তি পেয়েছে, খারাপও লাগত এই ভেবে তার জন্য বাবাকে জীবনে এতটা স্যাক্রিফাইজ় করতে হল। অনেকদিন ধরেই আরশি ভেবে রেখেছে, বড় হয়ে যখন চাকরিবাকরি করবে, নিজের উদ্যোগে খুঁজে বের করবে মাকে। জিজ্ঞেস করবে, 'মেয়েকে বড় না করে কেন পালালে তুমি? কীসের টানে? খ্যাতি কি সন্তানের চেয়েও বড়?'

সেদিনের কলটা যদি মায়ের হয়, তেমনটাই বিশ্বাস করতে মন চেয়েছে আরশির, তা হলে বলতে হবে, মা এতদিনে বুঝেছে সন্তানের চেয়ে প্রিয় আর কিছু হয় না। তাই অমন কাতর গলায় 'ঝুমু' বলে ডেকে উঠেছিল। আরশির মনে হতে থাকে মায়ের সঙ্গে দেখা হওয়াটা এখনই দরকার। ভাল নেই মা। গলা শুনে তেমনটাই বোধ হচ্ছিল। কিন্তু কী উপায়ে দেখা করবে? অত্যন্ত অপরিসর হলেও লহমা অজান্তে একটা রাস্তা এনে দিল সামনে। অপরিসর এই কারণে, আগে তো আরশির ছবি সিলেক্ট হতে হবে। তারপর ডাক পাবে অডিশনে। সেখানে গিয়েও সুমিত ঘোষের সামনে পৌঁছতে পারবে কিনা, কোনও ঠিক নেই। দেখা গেল অ্যাসিস্ট্যান্টরাই বাছাই করছে। তা করুক, ওইটুকু এন্ট্রি পেলেই মায়ের খোঁজ নেওয়া শুরু করবে আরশি। কাজটা একা-একা করা খুবই কঠিন। আরশি ঠিক করে রেখেছিল কোনওভাবে যদি ইভাস্ট্রিতে সামান্য প্রবেশও করে উঠতে পারে, পূর্বাকে খুলে বলবে তার এখানে আসার আসল কারণ। তারপর পূর্বাকে সঙ্গে করে মাকে খোঁজার চেষ্টা চালাবে।

কিন্তু সব কিছুই নির্ভর করছে আরশির ফোটো সিলেক্ট হওয়ার উপর। কৌশিকদার স্টুডিয়োতে গিয়ে আরশি পোর্টফোলিয়োর ফোটোগুলো তুলিয়েছিল। কৌশিকদার হাত ধরে বলেছিল, ''তোকে তো কবে থেকেই বলছি একটা পোর্টফোলিয়ো বানা। এত ফোটোজেনিক তুই! এতদিনে মতি হল! কোথায় পাঠাবি?''

''একটা ম্যাগাজ়িনে... মডেল খুঁজছে ওরা,'' বানিয়ে বলেছিল আরশি। গোটা ব্যাপারটা যতটা পারে গোপনে সারতে চায়। সেই কারণে পূর্বাকেও এখানে আসার আসল উদ্দেশ্যটা বলেনি। কৌশিকদার তোলা ফোটোগুলো লহমাকে মেল করে দিয়েছিল আরশি। দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ভেবেছিল, 'এত প্ল্যান করছি, দেখা গেল ফোটোই সিলেক্ট হল না!' গোটা ব্যাপারটা আরশির মাথা থেকে নামিয়ে রেখেছিল। হঠাৎ একদিন রাত ন'টা নাগাদ মোবাইলে নাম ভেসে উঠল লহমার। আরশির মন বলছিল ফোটো সিলেক্টেড। নয়তো এত রাতে ফোন করত না লহমা। কাল দিনের বেলায় কোনও এক সময় ফোন করে জানাত, ক্যানসেল্ড।

মোবাইল বাজে তো আরশি চলে গিয়েছিল বারান্দায়। কারণ ড্রয়িং রুমে বসে বাবার সঙ্গে টিভি দেখছিল সে। অনুমান একেবারে সঠিক। বিপুল উচ্ছ্বাসে লহমা জানিয়েছিল, ''তোর ছবি পছন্দ হয়েছে দীপনদাদের। দিনকুড়ি বাদেই অডিশন। আমি ওদের মেল এবং ফোন নম্বর হোয়াটসঅ্যাপ করে দিচ্ছি, কথা বলে নে।''

আরশি বলেছিল, ''তোকে একটা রিকোয়েস্ট করব?''

''কী? যাবি না তো অডিশন দিতে? সেটা আমি আগে থেকেই জানতাম! গ্ল্যামার জগৎ নিয়ে তোর কোনও আগ্রহ নেই সে আমি দেখেছি, বরং ফোটো পাঠাতে দেখে বেশ অবাকই হয়েছিলাম! আসলে দেখে নিলি নিজের মার্কেটভ্যালু!'' বলেছিল লহমা।

আরশি বলে, ''দাঁড়া, আগে আমায় বলতে দে। অডিশন দিতে আমি যাব। কিন্তু গোটা ব্যাপারটা তোকে সিক্রেট রাখতে হবে। আমাদের গ্রুপের অন্য কাউকে বলেছিস কি, আমার ফোটো সিলেক্টেড হয়েছে?''

''না, বলিনি, যার খবর, তাকে তো আগে জানাব,'' বলেছিল লহমা।

স্বস্তি পেয়েছিল আরশি। লহমাকে বলে, ''প্লিজ়, তুই কাউকে কিছু জানাস না। বন্ধুরা রোজ়ালট জানতে চাইলে বলবি সবার ফোটো ক্যানসেল্ড। আমিও বাড়িতে বলব না অডিশন দিতে যাচ্ছি। বাবা যেতে দেবে না। কোনও একটা অজুহাত তৈরি করে কলকাতায় পূর্বাদের বাড়ি উঠব। ওখান থেকে দিতে যাব অডিশন। ওরা যদি আমাকে চরিত্রটার জন্য পছন্দ করে, তখন সবাইকে সুখবরটা জানাব। আগে থেকে বলে রাখলাম, পরে যদি চান্স না পাই, বড্ড বোকা-বোকা লাগবে।''

''ওকে বস! কাউকে বলছি না, তবে তোমার বাবা যদি নিজের থেকে এসে জানতে চান, সত্যিটা বলতেই হবে... গার্জেনের কাছে কথা লুকিয়ে ফাঁসতে চাই না আমি,'' জানিয়ে দিয়েছিল লহমা।

আরশি বলে, ''ঠিক আছে বাবাকে শুধু বলিস। তবে মনে হয় না বলার মতো পরিস্থিতি তৈরি হবে।''

এরপরই সমস্ত পরিকল্পনা নিজের মতো সাজিয়ে নিয়েছিল আরশি। কিন্তু কোনও প্ল্যানই যে ফুলপ্রুফ হয় না, পাশাপাশি আর একটা রাস্তা রাখতে হয় এই শিক্ষাটা দিল পূর্বার মায়ের হার্টঅ্যাটাক।

এই হোটেলটায় ঢুকেই প্রথমে স্নান সেরে নিয়েছিল আরশি। তারপরই ফোন করেছিল পূর্বাকে, কাকিমার অবস্থা কেমন জানতে। তার সঙ্গে এই ভাবনাটাও ছিল, কাকিমার শরীর কন্ট্রোলে এসে গেলে, পূর্বা তাকে বাড়িতে ডেকে নেবে নিশ্চয়ই। তা হলে রাতের থাকাটা নিয়ে আর চিন্তা করতে হবে না।

ফোন বেজে গেল। ধরল না পূর্বা। তার মানে এখনও মাকে নিয়ে ব্যস্ত। ক্রাইসিস পিরিয়ড কাটেনি। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছিল আরশির। বেল টিপে সার্ভিস বয়কে ডেকে ব্রেড-বাটার, ডিমসেদ্ধ আনিয়েছিল। চা-ও খেল। সার্ভিস বয়কে জিজ্ঞেস করেছিল, ''কাঁকুলিয়া রোড কীভাবে যাব বলো তো?''

''এই তো হোটেল থেকে নামবেন, কিছুটা এগোলেই গোলপার্ক, ওপারে গিয়ে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই দেখিয়ে দেবে কাঁকুলিয়া রোড...'' বলার পর ছেলেটা জানতে চেয়েছিল, ''দুপুরে কী খাবেন আর সেটা ক'টায় দেব?''

''মাছ-ভাত দিয়ো, একটা নাগাদ,'' বলে সকালের খাবার সেরে ঘুমের প্রস্তুতি নিয়েছিল আরশি। জানলা বন্ধ করে অল্প স্পিডে পাখা চালিয়েছিল। ফেব্রুয়ারির শেষদিকটায় জলপাইগুড়িতে পাখা চালানোর কথা ভাবাই যায় না। এখানে কিন্তু গরম লাগছে।

ঘুম এল না কিছুতেই। মাথার মধ্যে নানা কথা ঘুরছে। একবার মনে হচ্ছে মায়ের অনেক কাছাকাছি চলে এসেছি, এই শহরেই তো আছে। ফিল্মের লোকেদের সঙ্গে কথা বললেই খোঁজ পেয়ে যাব। পরক্ষণেই মাথায় আসছে বড় হঠকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেল। রাতে থাকার কী হবে? এর চেয়ে বরং বাবাকে ফোন করলেই হত।

আসলে মায়ের কাছ থেকে অনেক কিছু জানার আছে আরশির। সত্যি কি মায়ের সংসারের প্রতি মন ছিল? গয়নাগাঁটি, সাজগোজের দিকে ঝোঁক ছিল বেশি? গান-আবৃত্তি তো ছিলই, নাটকেও অভিনয় করত। দেখতে ছিল দারুণ। জলপাইগুড়ি বা মামার বাড়ি মালদা থেকে অভিনয়, গান-আবৃত্তির জন্য ডাক পেত প্রচুর। কলকাতা ডেকে নিল একবার। আর ফিরল না মা। কেমন ছিল মা, তার সবটাই আত্মীয়-পরিজনের থেকে শোনা আরশির। সবাই বলে মায়ের টাকার লোভ ছিল, বিরাট খ্যাতি হোক চাইত। তেমনটা তো নাও হতে পারে! মা হয়তো চাইত নিজের গুণের কদর হোক আরও বড় পরিসরে। মফস্‌সলের গণ্ডির মধ্যে নয়। সেই জন্যই চলে এসেছিল কলকাতায়। মায়ের মনোভাব কী ছিল, জানতে চায় আরশি। মা-ও নিশ্চয়ই আরশিকে কাছে পেতে চাইছে। তাই এতদিন পর ওভাবে ফোন করেছিল। একে অপরকে দেখতে চাইলে, দেখা হতে আর কতক্ষণ! আরশির মনে হচ্ছে খুব তাড়াতাড়িই মায়ের মুখোমুখি হতে পারবে সে। তবে এগোতে হবে সাবধানে। সুমিত ঘোষের সঙ্গে দেখা হলেই মায়ের কথা তুলবে না। বাবাকে যেমন দায়সারা উত্তর দিয়েছিলেন, আরশিকে শুনতে হবে তেমনটাই। ক্যারেকটারের জন্য সিলেক্ট হোক বা না হোক, ইউনিটের লোকের সঙ্গে ভাল করে আলাপ করে নিতে হবে। তারপর ওদের কারও পরামর্শ অনুসারে খুঁজতে শুরু করবে মাকে।

ছোটবেলায় ঘুমের মধ্যে প্রায়ই মায়ের স্বপ্ন দেখত আরশি। বেশ কিছু বছর আর দ্যাখে না। স্বপ্নে দেখত মা অন্যের বাড়ির কত্রী। কারও সঙ্গে সেই বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছে আরশি। মা অতিথি আপ্যায়ন করছে। প্লেট এগিয়ে দিচ্ছে আরশির সামনে, এদিকে নিজের মেয়েকে চিনতে পারছে না! আরশি বলার চেষ্টা করছে, 'মা! আমি ঝুমু। চিনতে পারছ না...' গলা দিয়ে আওয়াজ বেরচ্ছে না আরশির, ঘুম ভেঙে যেত। এ ছাড়াও স্বপ্নে মায়ের সঙ্গে রাস্তা-ঘাটে, দোকান-বাজারে দেখা হয়েছে। ধাওয়া করেছে আরশি, মাকে ছুঁতে পারেনি। চোখে জল নিয়ে ঘুম ভেঙেছে তার। বাবা জিজ্ঞেস করেছে, ''চোখে জল কেন? স্বপ্ন দেখছিলি? কীসের স্বপ্ন?''

আরশি এটা-সেটা বলে কাটিয়ে দিয়েছে। মায়ের স্বপ্ন দেখে উঠল, কখনওই বলেনি। কষ্ট পাবে বাবা। মায়ের অভাব বুঝতে না দেওয়ার জন্য প্রাণপাত করে। জলপাইগুড়ির আদরপাড়ায় আরশির ঠাকুরদার করা বাড়ি। জ্যাঠা-কাকার সংসার ওখানেই। ওবাড়িতে জায়গা কম পড়তে পারে বুঝে বাবা বিয়ের আগে বাবুপাড়ার বাড়িটা করে। অন্য ভাইদের তুলনায় বাবার আর্থিক অবস্থা উপরের দিকে, ব্যাঙ্ক অফিসার। দু'বাড়ির মধ্যে যোগাযোগ ভাল। মায়ের সময় নাকি ততটা সম্ভাব ছিল না। মাকে পছন্দ করত না আদরপাড়ার বাড়ির লোক। মা-ও নাকি তাদের পাত্তা দিত না। মায়ের উপর রাগ থেকেই বোধ হয় জ্যেঠু একদিন বাড়ি এসে বাবাকে বলল, ''হ্যাঁ রে রজত, বারো বছর তো পেরিয়ে গেল। শোভার কোনও খবর এল না। শাস্ত্রমতে এবার ওর শ্রাদ্ধটা সেরেই ফেলা যায়। তোর কী মত?''

কথাটা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিল না বাবা। তারপর আবার মেয়ে বসে আছে কাছেই। তাকিয়েছিল আরশির মুখের দিকে। রাগে গনগন করছিল আরশির চোখ। মেয়ের মনোভাব বুঝে নিয়ে বাবা জ্যেঠকে বলেছিল, ''শাস্ত্র আজকাল কে-ই বা মানে। তা ছাড়া ওইসব করে লাভই বা কী?''

''শাস্ত্র তো হেলাফেলার লোক তৈরি করেনি, করেছেন দার্শনিক, পণ্ডিত মানুষ! সব দিক ভাবনা-চিন্তা করে মানুষের মঙ্গলের কথা ভেবে শাস্ত্র বিধি বাঁধা হয়েছিল, শোভা চলে গিয়েছে সেই কবে, এখনও তোরা ওকে ভুলতে পারছিস না! শোভা হয়তো আর নেই, খবরটা পাসনি বলে শ্রাদ্ধশান্তি করছিস না, ওর অতৃপ্ত আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে ইহলোকেই...'' জেঠু আরও অনেক কিছু বলে যাচ্ছিল। ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল আরশি। সে তখন বারো ক্লাস। জানে তার অমতে বাবা মোটেই মায়ের শ্রাদ্ধ করবে না। সমস্যা হয়েছিল একটাই, জেঠুর কথাটা শোনার পর থেকে বেশ কয়েক রাতে একটা স্বপ্ন দেখেছিল আরশি, মায়ের শ্রাদ্ধের কাজ হচ্ছে বাড়িতে। জোরে-জোরে মন্ত্রোচারণ করছেন পুরোহিতমশাই। ধুতি-চাদর পরে বাবা মায়ের ফোটোর সামনে বসে আছে। মা এসে দাঁড়িয়েছে বাড়ির দরজায়, মুখে অবাক ভাব। হঠাৎ ঘুরে গিয়ে হাঁটা দিল মা। এখন কী করবে আরশি?

রুমের বেল বেজে উঠল। চিন্তা ছিঁড়ে ধড়ফড় করে ওঠে বুক! জানলা থেকে সরে এল আরশি। কে বেল দিচ্ছে? কেন?

আস্তে করে দরজার ছিটকিনি নামায় আরশি। দরজা খুলে দেখে হোটেলের সেই সার্ভিস বয়। জিজ্ঞেস করল, ''ম্যাডাম, লাঞ্চ কি রুমে দেব? নাকি ডাইনিংয়ে আসবেন? একটা বাজে।''

''রুমেই দাও,'' বলল আরশি।

খাওয়াদাওয়া সেরে, বাছাই করে রাখা জিনস-কুর্তা পরে, কাঁধে ছোট পার্স নিয়ে আরশি যখন ক্রস করছে রিসেপশন কাউন্টার, রিসেপশনিস্ট লোকটা বলে উঠল, ''কী হল, আপনি লাগেজ নিলেন না?''

''এখনই কেন নেব? দিনের আলো তো নেভেনি!''

একটু থমকাল লোকটা। একটু ভেবে নিয়ে বলল, ''সন্ধের মধ্যেই ফিরবেন কিন্তু। নয়তো ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে রুম খুলে লাগেজ বাইরে রাখতে বাধ্য হব।''

ব্যাগে রাখা রুমের চাবিটা বের করে কাউন্টারে রাখল আরশি। বলল, ''ডুপ্লিকেট চাবির দরকার নেই। এটা দিয়েই খুলবেন রুম।''

● ৪ ●

চারটেই বাজল কাঁকুলিয়া রোডে ঢুকতে। সুমিতদার প্রোডাকশন অফিস খুব দূরে নয়। মোটর বাইকে মিনিট তিন। রাস্তা সরু, রিকশা চলছে, পথচারী, সব কাটিয়ে সাবধানে এগিয়ে চলেছে শৌর্য। মহুলিয়া থেকে ফিরে বাড়ি ঢুকে স্নান খাওয়ার সময় পেয়েছে। মা খুশি। গ্রামের মেয়েটিকে নামাতে হয়েছিল ল্যান্সডাউনের মোড়ে। মেয়েটি যখন 'ধন্যবাদ' দেওয়া শেষ করে উঠতে পারছিল না, শৌর্য বলেছিল, ''সত্যিই ইন্টারভিউ তো? না কি অন্য কিছু?''

মুহূর্তে আনন্দ উবে গিয়েছিল মেয়েটির মুখ থেকে। বলেছিল, ''অন্য কিছু মানে?''

''না মানে, আজ তো রবিবার, আজকে ইন্টারভিউ ব্যাপারটা কেমন-কেমন লাগছে না!'' মিচকি হেসে মন্তব্য করেছিল শৌর্য।

মেয়েটির চোখমুখ তখন সিরিয়াস। বলতে থাকল, ''যে মহিলা ফ্লাইট মিস করবেন বলে আপনার সঙ্গে আসতে চাইছিলেন, উনিই আপনার মাথায় ঢুকিয়েছিলেন, আমি যে সত্যি বলছি প্রমাণ কী! এতই যদি সন্দেহ, ওঁকে নিয়েই আসতে পারতেন।''

শৌর্য বলেছিল, ''আরে রাগ করছ কেন? কথাটা আমার অনেক পরে মাথায় এসেছে। তবে তোমায় অবিশ্বাসও হয়নি। জাস্ট জানতে চাইছি, কী ধরনের কাজের ইন্টারভিউ? উত্তর না

পেলেও চলবে।"

মেয়েটি বলল, "হসপিটালের চাকরি। প্রাইভেট হসপিটাল। রোজ খোলা। বিশ্বাস হল? আপনার ফোন নম্বরটা দিন। চাকরিটা হলে জানিয়ে দেব।"

"শুধু জানাবে! খাওয়াবে না?" বলে পার্স থেকে নিজের কার্ড বের করে মেয়েটিকে দিয়েছিল শৌর্য।

মেয়েটির হাতে ধরা ছিল হাইওয়ের ধার থেকে কেনা হেলমেট। শৌর্যকে দিয়ে বলেছিল, "রেখে দিন।"

"সে কী, এটা তো তুমি কিনেছ! তোমার জিনিস, আমি কেন নেব?" বিস্ময় প্রকাশ করেছিল শৌর্য।

মেয়েটি বলে, "এটা হাতে নিয়ে আমি ইন্টারভিউ দেব? গ্রামে ফিরব বাসে, কোলে রাখব হেলমেট? তার চেয়ে থাক না আপনার কাছে। আবার নিশ্চয়ই দেখা হবে। তখন কাজে লাগবে।"

মেয়েটা ভয়ঙ্কর রকমের রোম্যান্টিক, শৌর্য আবার রোম্যান্টিক মেয়েদের মুখোমুখি হলে নার্ভাস ফিল করে। এরা ভীষণ আনপ্রেডিক্টেবল। কখন কী বলবে, কী করতে চলেছে, আন্দাজ করা মুশকিল। হেলমেটটা নিয়েই বাড়ি ফিরেছিল শৌর্য।

সুমিতদার অফিসের সামনে ইউনিটের লোকজন ভর্তি। শৌর্যকে দেখেই সাড়া পড়ে গেল। দু'-তিনজন দৌড়ল শৌর্য আসার খবরটা সুমিতদাকে দিতে। গেট পেরিয়ে বাইক স্ট্যান্ড করল শৌর্য। জিন্স থেকে মোবাইল বের করে দেখে ছ'টা মিসড কল। জানে সব কলই সুমিতদার ইউনিটের। তবু একবার দেখে নেয়, যা ভেবেছে, তাই। হাইওয়েতে গাড়ি চালানোর সময় সুমিতদা দু'বার ফোন করেছিল। শৌর্য তখনই বলে দিয়েছে, "চারটের মধ্যে ঢুকছি। হাতির দল নেমে এসেছিল রাস্তায়। ওখানেই ঘন্টাখানেক লেটা।" তারপর থেকে যতগুলো ফোন এসেছে, একটাও ধরেনি শৌর্য।

তিনতলা বাড়ির একতলার সামনের পোরশন অফিসের জন্য ভাড়া নিয়েছে সুমিতদা। ক্যামেরার ব্যাগ কাঁধে নিয়ে এগোতে যাবে শৌর্য, কাস্টিং ডিরেক্টর নিবেদিতা হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এল। বলল, "লোকেশনে চলো। লাইট দেখে নাও। মেয়েগুলোর মেকআপ হয়ে গিয়েছে।"

"ক্যান্ডিডেট ক'জন?" জানতে চায় শৌর্য।

"ছ'টা মেয়ে অডিশনে সিলেক্ট হয়েছে, ধেড়িয়েছে দশজন... আলো থাকতে-থাকতে ছ'টা মেয়ের স্ন্যাপ নাও, তারপর আবার তাদের বাছতে বসতে হবে! যা চাপ যাচ্ছে না সকাল থেকে..." বলতে বলতে জিনস্-পরিহিত সামান্য ভারী চেহারার নিবেদিতা গেট পেরিয়ে গেল। শৌর্য মুখ তোলে আকাশের দিকে। আলোতে ময়েশ্চার নেই, ব্রাইট হবে ফোটো, লেন্সে ফিল্টার লাগাতে হবে। বাইকের সিটে ব্যাগ নামিয়ে ক্যামেরা বের করতে থাকে শৌর্য।

কাঁকুলিয়ার এই গলিতে শৌর্য আগেও শুট করেছে। এখানে অনেক বৈচিত্র্য, চালাঘরের বাড়ি, ছোটমোদির, দু'শো বছরের পুরনো ভেঙে পড়া একটা বাড়ি। যার সামনে অশ্বত্থ গাছ... চার নম্বর ক্যান্ডিডেট সাইকেল নিয়ে গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে, স্ন্যাপ নিচ্ছে শৌর্য, মেয়েটার সিলেক্টেড হওয়ার চান্স প্রচুর। গল্পের ক্যারেকটারের সঙ্গে চেহারাটা যাচ্ছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে মেয়েটার এক্সপ্রেশন নিয়ে। নিবেদিতা যেমন ভাবে দাঁড়াতে বলছে, তাকাতে বলছে, সবই করছে মেয়েটা। শৌর্যর ঠিক পছন্দ হচ্ছে না। নিবেদিতা কিন্তু 'ওকে' করে দিচ্ছে। ছ'টা স্ন্যাপ নওয়া হয়ে গিয়েছে শৌর্যর, মুখে অসন্তুষ্টি। শৌর্যর অভিব্যক্তি পড়ে নিয়ে নিবেদিতা কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, "এনি প্রবলেম? ঠিকঠাক যাচ্ছে না বলছ?"

ঠোঁট উলটে শৌর্য বলে, "সামথিং মিসিং।"

"কী সেটা?" জানতে চাইল নিবেদিতা।

"মেয়েটা আনমাইন্ডফুল হয়ে আছে, চোখের পাতা পড়ছে বেশি, অন্য কিছু ভাবতে-ভাবতে এক্সপ্রেশন দিচ্ছে... দাঁড়াও, একটু বুঝিয়ে বলি ওকে," বলে মেয়েটার দিকে এগোয় শৌর্য। সামনে গিয়ে বলল, "কী ভাবছ? এত অন্যমনস্ক কেন?"

"কিছু ভাবছি না তো!" বলল মেয়েটা।

"ক্যামেরার লেন্স কিন্তু তা বলছে না। সে তো শুধু তোমাকেই দেখছে। চারপাশের অন্য কিছু নয়। বুঝতে পারছি, তুমি শাড়ি পরে, চুল দু'ভাগ করে সামনে এনেও অন্য চরিত্র হতে পারনি। তুমি আগের মেয়েটাই রয়ে গিয়েছ, যে এভাবে সাজে না। নিজেকে সম্পূর্ণ ভুলে যাও। নিজের নামটাও। কী নাম তোমার?"

"আরশি। আরশি সেনগুপ্ত।"

"নামটা আমি নিয়ে নিলাম!" বলে শূন্য হাত মুঠো করে টি-শার্টের পকেটে ঢোকায় শৌর্য। তারপর বলে, "তোমার নাম এখন রুম্পা। গ্রামের মেয়ে। একেবারে অজ-গাঁ নয়। এবার নিবেদিতা যেমন বলেছে, তেমন করে পোজ দাও।"

কথা শেষ করে আগের জায়গায় ফিরে যায় শৌর্য। ক্যামেরা চোখে তুলে দেখে মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসছে মেয়েটা। নিবেদিতা ওকে সিরিয়াস ভঙ্গিতে কিছু বোঝাচ্ছে। শৌর্য বুঝতে পারে, এবার ছবি ভাল হবে। মেয়েটা কিছু একটা নিয়ে চিন্তায় ছিল, মাথা থেকে নেমে গিয়েছে সেটা। নিবেদিতা বেরিয়ে গেল ফ্রেম থেকে। এখন অশ্বত্থর ডালপালার ফাঁক দিয়ে নেমে আসা রোদের মাঝে সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে মেয়েটা, সে অবিকল 'দখিন হাওয়া' গল্পের রুম্পা।

সন্ধে নেমেছে সদ্য। ছ'জন মেয়ের ছবি তুলে ল্যাপটপে লোড করে দিয়েছে শৌর্য। যার মধ্যে চারজনকে বাদ দিয়ে দু'জনকে বাছল সুমিতদা। নিবেদিতাকে বলল, "বাকিদের চলে যেতে বল।"

"সে না হয় বললাম। কিন্তু আমাদের একজনকে দরকার। দু'জনকে থাকতে বলব কেন? একজনকে বেছে নাও, বাকি সবাইকে বাড়ি পাঠিয়ে দিই।"

স্ক্রিনে দু'জনের ফোটো অলটারনেটিভলি দেখতে-দেখতে সুমিতদা নিবেদিতাকে বলল, "যা বললাম, সেটা আগে কর। তারপর আয়, বলছি কেন দু'জনকে বাছলাম।"

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল নিবেদিতা। পাশের ঘরে অনেক প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষা করছে ছ'জন। সবাই অবশ্য প্রথম অডিশন দিচ্ছে না। কয়েকজনের স্মার্টনেস দেখে তেমনটাই মনে হচ্ছিল শৌর্যর। যে দু'জনের ছবি বেছেছে সুমিতদা, তার মধ্যে ওই মেয়েটা আছে, যাকে জ্ঞান দিতে হয়েছিল। তাকেই কেন সিলেক্ট করছে না সুমিতদা, কে জানে! কাস্টিং নিয়ে শৌর্যর নাক গলানো উচিত নয়। তার কাজ শেষ। লোকেশনের ছবিও দেখানো হয়ে গিয়েছে সুমিতদাকে। মন দিয়ে দেখেনি। আলগোছে বলল, 'দারুণ! প্রোডিউসরের সঙ্গে বসে আর একবার দেখব।'

শৌর্যর এবার বাড়ি ফেরার পালা। প্রোডাকশন থেকে রোল আর কফি দিয়ে গিয়েছে, এটা শেষ করেই উঠবে।

ফিরে এল নিবেদিতা। বলল, "দু'জনকে রেখে দিলাম। দু'জনেই রেজাল্ট জানতে চাইছে তাড়াতাড়ি। সন্ধে হয়ে গেল। বাড়ি যাবে তো ওরা।"

"এই মেয়েটা তো সিলেক্টেড। অন্যটাকে নিয়েই সমস্যা!

ল্যাপটপের স্ক্রিনে পরপর দু'জনের ছবি দেখিয়ে বলল সুমিতদা। যে মেয়েটাকে নিয়ে সমস্যা বলছে, সে-ই সিলেক্টেড হবে ভেবেছিল শৌর্য। তাই জিজ্ঞেস করে, ''সমস্যাটা কী মেয়েটার? আমি তো ভাবলাম ওকেই পছন্দ হবে তোমার। ক্যারেকটারের সঙ্গে ভালই যায়।''

''না, যায় না। মেকআপ করেও মেয়েটার সফিসটিকেসি ঢাকা যাচ্ছে না। অন্য মেয়েটা কিন্তু পারফেক্ট।''

নিবেদিতা বলল, ''যে পারফেক্ট নয়, তাকে নিয়ে সমস্যাটা কী?''

''মেয়েটাকে আমি যেন কোথায় দেখেছি!'' বলে রিভলভিং চেয়ারটায় পিঠ ছেড়ে শৌর্যদের দিকে ঘুরে বসল সুমিতদা। ল্যাপটপ রাখা টেবিল এখন পাশে। পা ছড়িয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে সুমিতদা বলল, ''এত চেনা লাগছে। অথচ মনে করতে পারছি না। ডিমেনশিয়া হয়ে গেল নাকি? মনে পড়েও পড়ছে না, ব্যাপারটা বড় অস্বস্তিকর।''

''কখন বা কবে তোমার মনে পড়বে, তার উপর নির্ভর করে ওদের তো বসিয়ে রাখতে পারি না! কী বলতে হবে বলো?'' জানতে চাইল নিবেদিতা। ছড়ানো পা নাচাতে-নাচাতে সুমিতদা বলল, ''ওদের দু'জনকে বল কাল দুপুর নাগাদ আসতে। তখন ফাইনাল ডিসিশন বলা হবে। এখন বলে দিলে, যে রিজেক্টেড হল, আউট অব সাইট হয়ে যাবে। কাল অবধি ভাবি। মনে পড়লে ওকেই জিজ্ঞেস করতে হবে। আর খচখচানি কাটানোর জন্য আজ রাতে দু'পাত্তর মাল বেশি খেতে হবে।''

''যা মনে করার কালকের মধ্যে কোরো... রিজেক্টেড মেয়েটার বাড়ি জলপাইগুড়ি, এখানে হয়তো কোনও আত্মীয়ের বাড়িতে উঠেছে, নিশ্চয়ই বলে রেখেছে এক দু'রাত থাকবে... ওকে বেশি দিনের জন্য আটকে রাখলে মুশকিলে পড়ে যাবে বেচারি!'' বলে নিবেদিতা আবার গেল পাশের ঘরে।

শৌর্য সুমিতদাকে বলল, ''আমি তা হলে উঠি?''

''উঠবি? আচ্ছা তা হলে ওঠ!'' বলার পর কী ভেবে আবার বলে সুমিতদা, ''হ্যাঁ রে, বাড়িটা ওরকম নতুন করে ফেলল! টিলার উপরের বাড়িটার তো কিছুই নেই। কী হবে এখন? ফোটো দেখে প্রোডিউসার যদি পিছিয়ে যায়!''

কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে মগটা হাত বাড়িয়ে টেবিলের উপর রাখল শৌর্য। বলল, ''আবার ওই অঞ্চলে যাও। নতুন বাড়ি দেখো।''

''তার সময়টা কোথায়? যতদিন শিমুল-পলাশ, ততদিন আশা। বসন্ত চলে গেলে প্রোডিউসরও রওনা দেবে। বলবে, সামনের বসন্তে আসবে। কিন্তু আমি জানি, আর আসবে না। এরা বসন্তের কোকিল নয়।''

''সে আমি আর কী করব বলো!'' বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল শৌর্য।

সুমিতদা অসহায় গলায় বলে, ''কাল দুপুর নাগাদ একবার আয় না অফিসে। প্রোডিউসর আসবে। দু'জন মিলে মালটাকে নতুন বাড়ি আর গুঁড়িয়ে যাওয়া বাড়িই খাওয়াব। নিবেদিতাও থাকবে।''

''ঠিক আছে, প্রোডিউসার আন দ্য ওয়ে হলে ডেকে নিয়ো...'' বলে ক্যামেরার ব্যাগ কাঁধে তোলে শৌর্য, ''ও কে, চললাম তা হলে,'' বলে দরজার দিকে এগোয়।

বাইরে এসে শৌর্য দেখে নিবেদিতা সিগারেট টানছে। একটু যেন ঘন-ঘন। তার মানে অস্থির হয়ে আছে মনটা। কাছে যায় শৌর্য, নিবেদিতা কাউন্টার এগিয়ে দেয়। সিগারেট কমই খায় শৌর্য। কোনও বন্ধু এভাবে এগিয়ে দিলে এড়ানো যায় না। নিবেদিতার সিগারেটে টান দিয়ে শৌর্য বলে, ''কী ব্যাপার, টেনশনে আছ মনে হচ্ছে?''

''ধুর! সুমিতদার সঙ্গে আর কাজ করা যাবে না। দুটো মেয়েই জিজ্ঞেস করছে, 'কাল শিওর জানতে পারব তো দিদি?' কী বলি বলো তো? সুমিতদা হয়তো কালও বলবে 'মনে পড়েনি।' বাতিল হয়ে যাওয়া মেয়েটাকে মিছিমিছি আটকে রাখা হবে। মেয়েটার ব্যবহারটা ভারী মিষ্টি। কত কথা বলল আমার সঙ্গে। কোথায় থাকি, আমার কাজের ধরনটা কেমন, মেয়েটাকে পরে 'না' বলতে আমার খারাপই লাগবে। চান্স পাবে কি না, তা নিয়ে ঘুরিয়েও প্রশ্ন করেনি। বরং যে মেয়েটা সিলেক্টেড, বারবার জিজ্ঞেস করছিল, 'হবে তো দিদি? একটু দেখবেন প্লিজ?' ''

''সিলেক্ট হওয়া মেয়েটা বোকা, তাই ভভাবে জানতে চাইছিল। অন্য মেয়েটা অনেক চালাক, গল্প করার ছলে তেল মারছিল তোমাকে। যাতে তোমার ভোট ওর দিকে যায়।''

''এতদিন এ লাইনে আছি, কোনটা তেল আর কোনটা ডিস্টিল ওয়াটার, ভাল করেই বুঝতে পারি। মেয়েটা তেল মারছে বলে মনে হয়নি।''

হাতে থাকা সিগারেটের টুকরো ছুড়ে ফেলে শৌর্য বলল, ''দ্যাখো, কী করবে। সুমিতদা তো আবার কাল আসতে বলল আমাকে। চেষ্টা করছি আসার। এখন বাই।''

শৌর্য বাইকে গিয়ে বসল। সোজা বাড়ি ফিরবে। যথেষ্ট টায়ার্ড লাগছে। মাকেও একটু সঙ্গ দেওয়া হবে। মা প্রায়ই বলে, ''রোববারটা অন্তত কোনও কাজ রাখিস না। অন্যদিন কতটুকু আর দেখা হয় তোর সঙ্গে! আমারও কলেজ থাকে।''

কাঁকুলিয়া রোডের মুখে এসে দাঁড়াতে হল শৌর্যকে। মেন রোডে ট্রাফিকের ভিড়। একটু ফাঁকা না হলে এগনো যাবে না। এপাশ-ওপাশ চোখ বোলাতে গিয়ে শৌর্যর দৃষ্টি স্থির হয় বাঁদিকের ফুটপাথে, বাতিল মেয়েটা না? এখনও দাঁড়িয়ে আছে। সেই কখন তো বেরিয়েছে সুমিতদার অফিস থেকে। মেয়েটাও এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। কেমন যেন দিশেহারা ভাব। ওকে কি কারও নিতে আসার কথা ছিল? নিজেকে চেনানোর জন্য হেলমেট খোলে শৌর্য। মেয়েটার সঙ্গে চোখাচোখি হয়। শৌর্য হাতের ইশারায় জানতে চায়, 'কী ব্যাপার! এখনও এখানে কেন?'

মেয়েটা শৌর্যর দিকে আঙুল তুলে কিছু একটা বোঝাতে চাইল। বুঝল না শৌর্য। হাত দেখিয়ে মেয়েটাকে অপেক্ষার ইঙ্গিত দিল। ফাঁকা হল মেন রোড। বাইক চালিয়ে বাঁদিকের মোড়ে ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়াল শৌর্য। মেয়েটা এগিয়ে এসেছে। পরনে এখন ওরিজিনাল ড্রেস, জিন্‌স, কুর্তা। কাঁধে ঝুলছে পার্স। শৌর্য জিজ্ঞেস করে, ''কেউ নিতে আসবে?''

মাথা নেড়ে 'না' বোঝাল মেয়েটা। শৌর্য বলে, ''তা হলে এখানে দাঁড়িয়ে কেন?''

''আপনার জন্য।''

মনের ভিতরে চমকায় শৌর্য। মেয়েটার মুখ দেখে ঠাট্টা মনে হচ্ছে না। চান্স পাবে কি না জানতে চাইছে কি? শৌর্য জিজ্ঞেস করল, ''আমাকে কী জন্য দরকার?''

''আমার বাড়ি তো জলপাইগুড়িতে। এখানে হোটেলে উঠেছি। শুধু দিনের বেলার জন্য থাকতে দিয়েছে। রাতে দেবে না।''

''তা আমি কী করতে পারি? অন্য হোটেল দেখো।''

''আপনার চেনা কোনও হোটেল আছে কি?''

"এসব প্রোডাকশনের ছেলেদের বলতে হয়। তারা তো এতক্ষণে বেরিয়ে গিয়েছে মনে হচ্ছে। প্রবলেমটা আগে বললে না কেন?"

"কখন বলব? একটা ঘরে অতক্ষণ ধরে বসিয়ে রাখলেন। কাউকে বলার সুযোগ পেলাম কোথায়?"

"আমি বসিয়ে রাখিনি। অডিশন সিলেকশন প্রোডাকশন এসব টিমের কাজ। আমার কাজ শুধু ছবি তোলা। তা আমাকেই হোটেল খুঁজে দেওয়ার লোক বলে মনে হল তোমার?"

"তা ঠিক মন হয়নি... জানি, নিজেকেই খুঁজে নিতে হবে, কিন্তু হোটেলে উঠতে গেলে নিজের নামটা তো লাগবে! সেটা যে আপনার কাছেই রয়ে গিয়েছে!" বলল মেয়েটা এবং এক চিলতে না হেসে। একদম সিরিয়াস মুখে লেগপুলটা করল।

গ্রাম-মফস্সলের মেয়েরা হঠাৎই খুব স্মার্ট হয়ে উঠেছে। আজ যে মেয়েটা শৌর্যর বাইক চেপে ইন্টারভিউ দিতে এল, সে-ও ফাজলামিতে কিছু কম যায় না। শৌর্য টি-শার্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে শূন্য মুঠো বের করে এগিয়ে দিল মেয়েটার দিকে। বলল, "এই নাও তোমার নাম।"

মেয়েটা নামটা নেওয়া এবং খুলে দেখার ভান করল। ভ্রূ কোঁচকানো মুখ তুলে বলল, "এমা, এটা কার নাম দিলেন! এটা তো আমার নয়। প্রচুর মেয়ের নাম পকেটে নিয়ে ঘোরেন দেখছি!"

'এ তো যন্ত্রর মেয়ে' কথাটা মনে-মনে আওড়াল শৌর্য। কপট

গাম্ভীর্যে বলল, "তোমার নামটা কী? দেখি পকেটে আছে, না কি পড়ে গেল।"

"নামটা নেওয়ার সময় তো দেখেই নিলেন! ভুলে মেরে দিলেন এর মধ্যে!" বলে হাসতে লাগল মেয়েটি।

শৌর্য বলল, "অদ্ভুত মেয়ে! রাতে কোথায় থাকবে ঠিক নেই, উনি হাসছেন।"

"টেনশন কাটানোর জন্য একটু হাসাহাসি করে নিলাম আর কী। সত্যি, কী করি বলুন তো? আমি একা দেখে দুটো হোটেল রুম দেয়নি। এই হোটেলটা যদিও বা থাকতে দিল, সেটাও শুধু দিনের বেলাটুকুর জন্য। এতক্ষণে বোধ হয় রুম থেকে আমার লাগেজ বের করে দিয়েছে। দু'বার ফোন করেছিল সঙ্কে নামতেই। ধরিনি। রেজিস্টারে ফোন নাম্বারটা দেওয়াই ভুল হয়েছে।"

"না লিখলে, লিখিয়ে নিত। তা হোটেলটা কোথায়? কী নাম?" জিজ্ঞেস করে শৌর্য।

আরশি বলল, "হোটেলটার নাম 'পার্ক সেন্টার'। এখান থেকে কাছেই। কোন রাস্তা ধরে এলাম, বুঝে উঠতে পারছি না।"

শৌর্য বুঝল, এখনই বাড়ি ফেরা হবে না। মেয়েটার একটা গতি করতে হবে। আরশিকে বলল, "উঠে এসো বাইকে। দেখি, লোকের থেকে খোঁজ নিই হোটেলটার।"

ইন্টারভিউ দিতে আসা মেয়েটার হেলমেট ঝুলছে বাইকে, সেটাই এগিয়ে দেয় আরশিকে। অজান্তেই একজনের উপকার করে ফেলল গ্রামের মেয়েটা। ভদ্রতা করে ওর নামটা জানা উচিত ছিল। সৌজন্য ব্যাপারটা শৌর্যর বেশ কম।

একজনকে জিজ্ঞেস করেই 'পার্ক সেন্টার'-এর সামনে পৌঁছে গেল শৌর্য। হোটেলটা গোলপার্ক থেকে সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ে ঢুকেই। বাইক থেকে নেমে আরশি বলে উঠল, "এ মা, এত সোজা! অথচ রাস্তাটা আমি খেয়াল করতে পারছিলাম না!"

বাইক স্ট্যান্ড করে শৌর্য জিজ্ঞেস করে, "গোলপার্কে কি প্রথমবার?"

"কলকাতাতেই ফার্স্ট টাইম।"

একটু অবাক হয় শৌর্য, জলপাইগুড়ি আর কতদূর! সচ্ছল বাড়ির মেয়ে, কলকাতায় আসেনি!

কাচের দরজা ঠেলে রিসেপশনে পৌঁছল শৌর্যরা। রিসেপশনিস্ট লোকটা শৌর্যর দিকে ভাল করে তাকালই না। আরশিকে বলল, "লাগেজ বের করে নিন। রুম অন্য পার্টিকে দিয়েছি। এখনই আসবে তারা।"

"সে কী, আপনি এখনও বের করে দেননি। আমি ভাবলাম এসে দেখব কাউন্টারের বাইরে ফেলে রেখেছেন!" বলল আরশি।

লোকটা বলল, "এখন এরকম বলছেন। তখন আবার বলতেন, 'আমার লাগেজে হাত দিলেন কেন? অমুক জিনিসটা নেই দেখছি!' "

"আপনার কি মনে হয়, মেয়েটা এতটাই খারাপ? মিথ্যে অপবাদ দেবে? গতকাল পর্যন্ত একে তো আপনি চিনতেন না, কী করে ধরে নিচ্ছেন মেয়েটা সুবিধের নয়?" রিসেপশন কাউন্টারের উপর দু'হাত রেখে জানতে চাইল শৌর্য।

রিসেপশনিস্ট লোকটা অবাক হয়ে বলল, "আমি কোথায় বললাম উনি সুবিধের নন। যা বলার তো আপনিই বলছেন।"

"ও যদি ভাল মেয়ে হয়, তা হলে রাতে থাকতে দিচ্ছেন না কেন?"

"কেন দিতে পারছি না, সেটা তো ওঁকে বলেছি। উনি রাজিও হয়েছেন শুধু দিনের বেলা থাকার কন্ডিশনে। এরপর আর কী কথা থাকতে পারে!"

"কেন থাকতে দিতে পারছেন না, আমাকে বলুন। ও উপায় না দেখে তখন রাজি হয়ে গিয়েছিল।"

"আপনাকে বলতে আমি বাধ্য নই! আপনি আমাকে জোর করতে পারেন না," বলার পর রিসেপশনিস্ট আরশিকে বলল, "প্লিজ, রুমে গিয়ে লাগেজ বের করে নিন। লোকজন সঙ্গে এনে কোনও লাভ হবে না।"

আরশি বুঝতে পারছে না কী করবে! একবার শৌর্যর দিকে তাকাচ্ছে পরের বার রিসেপশনের লোকটার দিকে। এক-এক করে সার্ভিস বয়রা এসে দাঁড়াচ্ছ কাউন্টারের পিছনে। কাউকে ডায়াল করে ফোন কানে নিয়েছে শৌর্য। বলে উঠল, "দাঁড়াও বলছি..." তারপর বেরিয়ে গেল কাচের দরজাটা ঠেলে। আরশি লক্ষ রাখে শৌর্যর গতিবিধি, হাল ছেড়ে দিয়ে যদি চলে যায়

ফোটোগ্রাফার, তা হলেই কেলো!

শৌর্য ফোনে সুমিতদাকে ধরেছে। বলছে, "অডিশনের যে মেয়েটাকে চেনা-চেনা লাগছে তোমার, থাকে জলপাইগুড়ি। দিনের বেলা থাকার শর্তে হোটেল পেয়েছিল। রাতে থাকবে কোথায়? রিসেপশনে রিকোয়েস্ট করছি, রাজি হচ্ছে না।"

"তোরও কি মেয়েটাকে চেনা লেগেছ? তাই ওকে হেল্প করছিস?" ফোনের ওপার থেকে সত্যিকারের কৌতূহলে জানতে চাইল সুমিতদা।

শৌর্য বলল, "একটুও চেনা লাগেনি। মেয়েটাই আমার হেল্প চেয়েছে। আর মনে রেখো, সে এসেছে তোমার সিনেমার অডিশন দিতে। দায়িত্ব তোমার, আমার নয়।"

"ও কে, বুঝেছি। হোটেলের লোকেশনটা বল..."

"সাদার্ন এভিনিউ। হোটেলের নাম 'পার্ক সেন্টার'।"

"ঠিক আছে, ব্যবস্থা করে দিচ্ছি... মেয়েটাকে চিন্তা করতে বারণ কর," বলে ফোন কাটল সুমিতদা। শৌর্য জানে সুমিতদা পারবে ব্যবস্থা করতে, কানেকশন অনেক উপর অবধি। কাচের দরজা ঠেলে রিসেপশনে এল শৌর্য। লোকটাকে বলল, "আপনি কিন্তু সমস্যায় পড়ে যাবেন। ফোন আসছে। নিরীহ একটা মেয়েকে কোথায় হেল্প করবেন, তা নয়। হ্যারাস করছেন।"

আরশি খেয়াল করে শৌর্যর কথায় ঘাবড়েছে লোকটা, ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে মুখ। কিন্তু ফোন সত্যি আসবে তো? ফাঁকা বুলি দিচ্ছে না তো শৌর্য? ছেলেটাকে একদিন দেখে, এত ভরসা করা কি ঠিক হচ্ছে?... ভাবনা শেষ হতে না হতেই কাউন্টারে রাখা হোটেলের ফোন বেজে উঠল। সামান্য চমকে ওঠে আরশি। রিসেপশনিস্ট তুলে নিল রিসিভার। "হ্যালো" বলার পর থেকে বিশেষ কিছু বলল না, "হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে স্যার, ওকে..." বলে নামিয়ে রাখল রিসিভার। শৌর্য জিজ্ঞেস করল, "এবার ঠিক আছে?"

"থানার সঙ্গে আপনার এত চেনাজানা আগে বললেই পারতেন! খামোকা ঝগড়া করে ফেললাম!"

'কেমন দিলাম' টাইপের হাসি হাসছে শৌর্য। যদিও থানা থেকে ফোন আসাটা তেমন পছন্দ হয়নি, পুলিশের ডিজি বা কোনও মন্ত্রীর ফোন এলে আরও রয়াল নেওয়া যেত। রিসেপশনিস্ট আরশিকে বলছে, "যান ম্যাডাম, রুমে যান। আপনারা দু'জনেই যেতে পারেন। চা পাঠিয়ে দিচ্ছি..."

"কোনও দরকার নেই," প্রস্তাব নাকচ করে শৌর্য আরশিকে বলল, "তুমি গিয়ে রেস্ট নাও। আজ তো অনেক চাপ গিয়েছে। কাল দুপুরেও আবার যেতে হবে রেজাল্ট জানতে, ক'টায় আসতে বলেছে নিবেদিতা?"

"দুপুর দু'টো নাগাদ। আপনি থাকবেন?"

"ঠিক নেই, এখন চলি... গুডনাইট," বলে বাইরেরর দরজার দিকে ঘুরতে যাবে শৌর্য, দাঁড়িয়ে পড়ে। পকেট থেকে পার্স বার করে, ভিজিটিং কার্ড তুলে এগিয়ে দেয় আরশির দিকে। বলে, "এতে ফোন নাম্বার আছে। দরকারে ফোন করো।"

ঘাড় হেলিয়ে কার্ডটা নেয় আরশি। শৌর্যর যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে। মনে-মনে বলে, 'এর নির্ঘাত স্টেডি গার্লফ্রেন্ড আছে এবং তার প্রতি এতটাই কমিটেড, সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে ফাঁকা ঘরে চা খাওয়ার সুযোগটাও নিল না!

রুমে যাওয়ার জন্যে ঘুরে গিয়ে পা বাড়াল আরশি, রিসেপশনিস্ট লোকটা মধুমাখানো সুরে বলল, "দিদিভাই, আপনার রুমের চাবি। রেখে গিয়েছিলেন।"

কাউন্টার থেকে আরশি তুলে নেয় লোকটার রাখা চাবি। পুলিশের একটা ফোনে লোকটা 'ম্যাডাম' থেকে 'দিদিভাই' সম্বোধনে চলে এসেছে, কত আন্তরিক ব্যবহার!

● ৫ ●

হিন্দুদের এত দেবদেবী, কোনও একজনকে বেছে নিয়ে কিছু চাওয়া বেশ ঝামেলার ব্যাপার। কার কতটা পাওয়ার, সে ব্যাপারেও স্পষ্ট ধারণা নেই আরশির। সে আপাতত নিজেদের বাবুপাড়ার কালীমন্দিরের মাকে স্মরণ করে বলছে, 'মা আমাকে সিনেমায় চান্সটা পাইয়ে দাও। না পেলে নিজের মাকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে যাবে।' আজ অডিশন দিতে গিয়ে ইউনিটের লোকজনের সঙ্গে আলাপ জমানোর চেষ্টা করছিল আরশি, কেউ তেমন পাত্তা দিচ্ছিল না। সবাই ভাবছে সিলেক্ট হওয়ার জন্য ভাব জমাচ্ছে। বাছাই করে শেষের দিকে যখন দু'জন ক্যান্ডিডেট দাঁড়াল, নিবেদিতাদি একটু কথাবার্তা বলছিল। তাও আরশি যখন ফোন নম্বর চাইল নিবেদিতাদির, সে বলেছিল, 'এখন নিস না ভাই। ফোন ধরে-ধরে আমার কান দুটোর অবস্থা খুবই খারাপ। সিলেক্টেড হলে নিস।'

অর্থাৎ তুমি যদি চরিত্রের জন্য পছন্দ না হও, ইন্ডাস্ট্রির বাইরে থেকে গেলে। অন্য ক্যান্ডিডেটও খুব স্ট্রং। টাফ কম্পিটিশন। তাই তো ওরা আজ ডিসিশন নিতে পারল না। অন্য মেয়েটির নাম শতরূপা। দেখতে খুবই সুন্দর। কলকাতার নাটকের দলে অভিনয় করে। থাকে টালিগঞ্জে। ও বারবার বলছিল, "তুমিই সিলেক্ট হবে আরশি। দেখে নিয়ো। তুমি আমার চেয়ে অনেক সুন্দর দেখতে।"

কথা উড়িয়ে দিয়ে আরশি বলেছে, "আরে ধুর, আমি তো মেন জায়গাটাতেই উইক। তোমার মতো অভিনয় পারি না। তা ছাড়া তুমিও কিছু কম সুন্দরী নও!"

"তোমার মধ্যে একটা স্পনটেনিয়াস ব্যাপার আছে, খুবই সপ্রতিভ তুমি... এখানকার সবার সঙ্গে কী তাড়াতাড়ি আলাপ করে নিচ্ছ! কোনও জড়তা নেই, টেনশন নেই, একেবারে ফ্রেশ লুক! নায়িকা হিসেবে নতুন মুখের জন্য এরা এই ধরনের লুকই খোঁজে..." শতরূপা নিজের ব্যাপারে প্রায় হাল ছেড়ে কথাগুলো বলেছিল। আরশি কম্পিটিশন পছন্দ করে না। জীবনে ফার্স্ট-সেকেন্ড খুব কমই হয়েছে। এবার কিন্তু সে জিততে চায়। কী হয় দেখা যাক। এখন বাবুপাড়ার কালীমায়ের উপর ভরসা।

আরশির কেন জানি মনে হচ্ছে মা কালী অলরেডি তাকে ফেভার করে যাচ্ছেন। কলকাতায় আসার জন্য আরশি যখন লাগেজ প্যাক করছিল, কাজের লোক মঙ্গলামাসি কাগজ মোড়া কী একটা এনে বলল, "এটা ব্যাগে ঢুকিয়ে নাও।"

"কী এটা?" জানতে চেয়েছিল আরশি। খুলতে যাচ্ছিল মোড়কটা। মঙ্গলামাসি বলেছিল, "খুলে দেখার কিছু নেই। বাবুপাড়া কালীমায়ের ফুল। রেখে দাও সঙ্গে। পথে বিপদআপদ হলে, উনি রক্ষা করবেন।"

রাতে এই হোটেলেই থাকতে পারাটা তো একটা বিরাট রক্ষা পাওয়া। তারপরও বেঁচেছে একটুর জন্য, রুমে ঢুকতেই ফোন এল পূর্বার। বলল, "দু'বার কল হয়ে গেল, তুললি না। আমি ভাবলাম কী ব্যাপার! এখনই কাকাবাবুকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম।"

"রাস্তায় ছিলাম রে, ফোনের আওয়াজ শুনতে পাইনি!" বলার পর আরশি জিজ্ঞেস করেছিল, "কাকিমা এখন আছে কেমন? এটা জানার জন্য একবার কল করেছিলাম তোকে।"

পূর্বা বলেছিল, "হ্যাঁ, মিস্‌ড কল দেখেছি, তখন এমন ব্যস্ত ছিলাম মাকে নিয়ে... সিচুয়েশন আপাতত আন্ডার কন্ট্রোল। আইসিসিইউতে আছে মা। ডাক্তাররা অবশ্য এখনও বলেনি পেশেন্ট আউট অব ডেঞ্জার।"

আরশি জিজ্ঞেস করেছিল, "তুই এখন কোথায়, বাড়ি না হাসপাতালে?"

"বাড়ি ফিরলাম খানিকক্ষণ হল... ওরা রাতে একজনের বেশি পেশেন্ট পার্টি অ্যালাউ করে না, মামা আছে হাসপাতালে," বলার পর পূর্বা জানাতে চাইল, "তুই উঠলি কোথায়?"

"পিসির বাড়ি, নিজের পিসি নয়, দূর সম্পর্কের," বলেছিল আরশি।

পূর্বা জিজ্ঞেস করল, "জায়গাটা কোথায়?"

"গোলপার্কের কাছে," বলেছে আরশি। কারণ এর চেয়ে বেশি কলকাতা সে চেনে না। ফের আরশিই জানতে চায়, "কাকিমাকে কোন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে রে? কাউকে সঙ্গে পেলেই একবার দেখতে যাব।"

হাসপাতালের নাম ঠিকানা বলেছে পূর্বা। নামটা আর মনে নেই। রাস্তার নামটা মনে আছে, ক্যামাক স্ট্রিট। এরপর বাবাকে ফোনে ধরেছিল আরশি। বাবা বলল, "কী ব্যাপার, এত তাড়াতাড়ি ফোন করলি! রাতের দিকে করবি বলেছিলি তো।"

"করে নিলাম... পরে দুই বন্ধু গল্প করতে-করতে যদি ভুলে যাই!" বলেছিল আরশি।

বাবা খুশি-খুশি গলায় মন্তব্য করল, "মনে হচ্ছে তুই ওখানে পূর্বার সঙ্গে আড্ডা মারতেই গিয়েছিস। মাস কমিউনিকেশনের খোঁজ নেওয়াটা ছুতো।"

"মোটেই না। তবে একটা কথা শুনে রাখো, আমি নিয়ম করে সকাল-রাত্তির ফোন করতে পারব না। এক-দু'বার মিস হয়ে যেতে পারে। একদম টেনশন করবে না। আর কখনও যদি আমাকে ফোনে না পাও, পূর্বাদের কল করতে যাবে না। এদের সামনে আমি এমব্যারাসড ফিল করব। একটু ধৈর্য ধরবে। আমি ঠিক ফোন করব তোমাকে।"

বাবার ফোন আসাটা কমাতে চেয়ে কথাটা বলেছিল আরশি। যত ফোন আসবে, তত মিথ্যে বলতে হবে। কন্ডিশন মেনে নিয়েছে বাবা। বাবা আর পূর্বার মধ্যে একবার কথা হয়ে গেলেই আরশির অভিযান বন্ধ।

বাবার সঙ্গে কথা শেষ হতেই রুমে চা-স্ন্যাকস নিয়ে ঢুকেছিল সার্ভিস বয়। চা খেয়ে বাথরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে এসে মোবাইলে ফেসবুক খুলল। ওকে অনলাইন দেখে ধেয়ে এল বন্ধুদের চ্যাট। শুধু লহমারই চ্যাটের উত্তর দিল আরশি। লহমা লিখেছে, "কেমন হল অডিশন?"

আরশি লিখল, "ভালই। তবে রেজাল্ট এখনও জানায়নি। দু'জনকে বেছে রেখেছে, যার মধ্যে একজন আমি। কাল ফাইনাল ডিসিশন জানাবে। কিন্তু তোর দীপনদাকে দেখলাম না তো!"

"ছিল, পরিচয় দেয়নি তোকে, নিজের লোক পেয়ে যদি লুঙ্গ দিয়ে দিস কম্পিটিশনে! ধরে নিতে পারিস ভিতরে আমার লোক আছে, হয়ে যাবে..." এখানে এসে কিছুক্ষণ থেমে ছিল লহমা। ফের টাইপ শুরু করে, "দীপনদা বলছে তোর সিলেক্টেড হওয়ার চান্সই বেশি। ইউনিটের সবাই বলছে। অবশ্য পুরোটাই ডিরেক্টরের উপর ডিপেন্ড করছে। এখন দেখা যাক, হোপ ফর দ্য বেস্ট।"

আরশি লিখল, "ঠাকুরকে ডাক যেন হয়ে যায়।"

"হবেই, ফিরে এসে পার্টি দিতে হবে কিন্তু!" লিখল লহমা।

আরশি লিখেছে, "পার্টি তো হবেই। তোর জন্য কলকাতা থেকে কী নিয়ে যাব বল?"

"একটা হ্যান্ডসাম ছেলে।"

লেখার পর বেশ ক'টা স্মাইলি পাঠিয়েছিল লহমা। তারপর দুই বন্ধু নানা ইমোজি বিনিময় করে শেষ করেছিল চ্যাট। কিছুই করার নেই দেখে ঘরের টিভিটা চালাল আরশি। একটা হিন্দি সিনেমার মাঝখান থেকে দেখা শুরু করল। মন বসে গেল তাড়াতাড়ি। রাজস্থানের এক গ্রামের পটভূমিকায় ছবি। এক বিধবা যুবতীকে নিয়ে গল্প। যার স্বামী সৈনিক, মারা গিয়েছে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে। আচ্ছা, ওই গ্রামের প্রেক্ষাপটে যারা অভিনয় করেছে, তারা প্রায় সকলেই শহরের মানুষ, কী সুন্দর মানিয়ে গিয়েছে গ্রামে। শৌর্যর কথামতো এরা সকলেই নিজের নাম-ধাম ভুলে গিয়ে অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছে। মা-ও অভিনয় করতে গিয়ে সেই যে ভুলে গিয়েছিল নিজের পরিচয়! ষোলো বছর পর মনে পড়ল? আরশি জানে, এটা আবেগের ভাবনা। বাস্তব অনেক কঠিন। ফোনের গলা শুনে বোঝা যাচ্ছিল যে মা নিজের পছন্দ করা জীবনে হেরে গিয়েছে। ফিরতে চাইছে, পুরনো সংসারে। অথবা মা আর বেঁচেই নেই। ফোনটা করেছে অন্য কেউ। কোনও বদ মতলব আছে তার। মতলবটা কী হতে পারে? এসবই ঘুরিয়েফিরিয়ে ভেবে যাচ্ছে আরশি। মাঝে ডিনার নিয়ে এসেছিল সেই ছেলেটা যে আরশির রুমে সার্ভিস দিচ্ছে। খাবারের প্লেট পালটে গিয়েছে। একদম নতুন। আইটেম লাক্ষের চেয়ে ভাল। এসব জুটছে শৌর্যের কল্যাণে। ছেলেটা খুবই দায়িত্বশীল, ওর উপর চোখ বুজে নির্ভর করা যায়। তবে আরশি যা জ্বালিয়েছে, মনে হয় না আর দেখা করবে। শৌর্য বলেই দিয়েছে, প্রোডাকশনের ও কেউ নয়। সিলেকশনের জন্য ফোটো তোলাটা শুধু ওর কাজ।

খাবার দেওয়ার পর সার্ভিস বয় বলেছিল, "থালা-বাটিগুলো দরজার বাইরে রেখে দেবেন। সকালে নিয়ে নেব।"

"সকালে নেবে কেন? এখনই ঘুমিয়ে পড়বে নাকি?" জিজ্ঞেস করেছিল আরশি।

ছেলেটা বলল, "না, বাড়ি যাব। কাছেই বাড়ি। আবার সকালে চলে আসব।"

প্রমাদ গুনেছিল আরশি। জিজ্ঞেস করেছিল, "অন্য সার্ভিস বয়রা নিশ্চয়ই থাকবে?"

"কেউ থাকবে না ম্যাডাম, সবার বাড়িই আশপাশে..." বলেছিল ছেলেটা।

আরশি বলে, "সে কী, রাতে যদি কিছু দরকার পড়ে, কাকে ডাকব?"

ছেলেটা বলল, "ম্যানেজারদা আছে। নীচের ঘরে থাকবে। কোনও দরকার পড়লে এ রুমের বেল টিপবেন।"

আরশি জানতে চায়, "ম্যানেজারদাটা আবার কে?"

"ওই যে, মিনি কাউন্টারে ছিলেন, উনিই হোটেলের ম্যানেজার," বলার পর চলে যাচ্ছিল সার্ভিস বয়। আরশি ডেকে জিজ্ঞেস করেছিল, "শোনো না ভাই, হোটেলে ক'টা রুমে বোর্ডার আছে?"

"আপনাকে নিয়ে দুটো রুম। বাকি সব খালি।"

বুকটাই খালি হয়ে গিয়েছিল আরশির। চলে গিয়েছিল সার্ভিস বয়। তবু ভাল কলকাতার রাস্তায় অনেক রাত অবধি গাড়ি ঘোড়া চলে। আওয়াজগুলোই মনে জোর দিচ্ছিল। খাওয়াদাওয়া সেরে রাস্তার দিকের জানলা বন্ধ করে শুতে এল। ঠান্ডা হাওয়া আসছিল জানলা দিয়ে। ঘুম কিন্তু এল না। হোটেল তো নিস্তব্ধই। যত রাত

বাড়ল বাইরের গাড়ির আওয়াজ আর আসছিল না। অজানা অচেনা জায়গায় এত রাতে একা কোনওদিন থাকেনি আরশি। বুক ধকধক করে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ হল চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমনোর চেষ্টা চালাচ্ছে আরশি, আসছে না ঘুম। এই পরিবেশের কারণেই হয়তো মাথায় একটা নেগেটিভ চিন্তা ঘুর পাক খাচ্ছে, মা হয়তো বেঁচে নেই। হয় সুইসাইড করেছে, নয়তো খুন করেছে কেউ। সিনেমার জগতে এরকম ঘটনার কথা প্রায়ই শোনা যায়। ভুলভাল চিন্তার চাপে দমবন্ধ অবস্থা আরশির, উঠে বসে বিছানায়। টিভিটা একবার চালাবে কি? তাতে যদি একা ভাবটা কাটে। বিছানায় রিমোটটা খুঁজতে থাকে, পায় না। কোথায় যে রাখল! বন্ধ দরজার বাইরে কীসের যেন আওয়াজ... পায়ের আওয়াজ মনে হচ্ছে। কে দরজার সামনে ঘুরঘুর করছে এত রাতে! অন্য যে রুমে বোর্ডার আছে, তাদের কি কেউ? এখনই টোকা মারবে দরজায়? বুক ছ্যাঁৎ করে ওঠে আরশির। না, ভয় পেলে চলবে না। ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে লাঠি জাতীয় কিছু খোঁজে। না, সেরকম কিছু নেই। গ্রাউন্ড ফ্লোরের ঘরে আদৌ ম্যানেজার আছে তো? নাকি সে-ও চলে গিয়েছে নিজের বাড়িতে শুতে? সার্ভিস বয় মিথ্যে সান্ত্বনা দিয়ে গেল! ম্যানেজার না থাকলে অন্য ঘরের বোর্ডার যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। দরজা ভেঙে ঢুকে পড়ে যদি, তারপর আরশি শুধুই খবরের কাগজের খবর। কোমর থেকে শরীরের নীচটা কেমন অবশ-অবশ লাগছে আরশির, কিন্তু এভাবে বসে থাকলেও তো চলবে না, নিজেকে বাঁচানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

বিছানা থেকে নেমে পা টিপে-টিপে জানলার কাছে যায় আরশি। ছিটকিনি খোলে জানলার। আওয়াজটা বড্ড জোরে হল। কোনও শব্দ করা চলবে না। দরজার বাইরের লোকটা হয়তো ঠাহর করতে উঠতে পারছে না, কোনটা আরশির রুম। লোকেট করে ফেললে এতক্ষণে দরজায় টোকা পড়ে যেত।

জানলা খুলে কোনও লাভ হল না। রাস্তার আলো ঝিমিয়ে পড়েছে কুয়াশায়। নীচ থেকে কুকুরের ডাক ভেসে এল। ডাক নয়, কান্না। একটানা। জানলা থেকে সরে আসে আরশি। ঘরের বাইরে আওয়াজটা এখন আর নেই। এগিয়ে বন্ধ দরজায় কান রাখে। রুমের মধ্যে ডেকে ওঠে টিকটিকি। আরশির গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। দরজার ওপারে আওয়াজটা শোনা যাচ্ছে আবার। পায়চারি করছে কেউ। পায়ের শব্দ দূরে গিয়ে ফিরে আসছে। ভারী পা নয়, কোনও মহিলার পদচারণ বলেই মনে হচ্ছে। চটি আছে মহিলার পায়ে। রাস্তায় পড়ে থাকা শুকনো পাতায় হাওয়া লেগে সরে যাওয়ার মতো শব্দ আসছে। মহিলা বোধ হয় দূরে চলে গেলেন। সন্তর্পণে ছিটকিনি নামিয়ে দরজার পাল্লা সামান্য ফাঁক করে আরশি, অন্তরাত্মা পর্যন্ত কেঁপে ওঠে, গলায় ফসিটানা সাদা ওড়না সমেত করিডোর ধরে হেঁটে যাচ্ছে একটি মেয়ে। পিছনটা দেখতে পাচ্ছে আরশি। ফাঁস ছাড়া বাকি ওড়না লুটোচ্ছে মাটিতে। কে মেয়েটা? এই হোটেলে সুইসাইড করেছিল যে? সারাদিন ঘরে আটকে থেকে ঘুরতে বেরিয়েছে রাতে। পাল্লা বন্ধ করে ফ্লোরে বসে পড়েছে আরশি। সারা শরীর কাঁপছে থরথর করে, কী ভীষণ শীত করছে! মা-ও হয়তো কোনও হোটেলের রুমে সুইসাইড করেছিল! অথবা মেরে কুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল...

● ৬ ●

রিংটোনটা দারুণ! অনুষ্কাশঙ্করের সেতার। রাগ পিলু। পাতলা ঘুমে কী ভাল যে লাগছে শুনতে! শৌর্য আবার তলিয়ে যাচ্ছে ঘুমে। হঠাৎ খেয়াল হল, 'আরে, এটা তো আমার ফোনের রিংটোন। মাঝরাতে কে ফোন করল? কোনও খারাপ খবর কি?' বালিশের পাশ থেকে ফোনসেট নিল শৌর্য, স্ক্রিনে অচেনা নাম্বার। তবে বিদেশের নয়। আজকাল নাকি বিদেশ থেকে জালিয়াতির কল আসছে হামেশাই। কল রিসিভ করে শৌর্য "হ্যালো" বলতেই, এ প্রান্ত থেকে ভেসে এল কোনও এক মেয়ের আর্তস্বর, "প্লিজ, এখনই আমাকে এই হোটেল থেকে নিয়ে যান। ভীষণ ভয় করছে আমার।"

"কে আপনি? রং নম্বর ডায়াল করেছেন মনে হচ্ছে। কাকে চাইছেন?" পরপর বলে গেল শৌর্য।

ও প্রান্ত কান্নাভেজা গলা বলে উঠল, "আপনাকেই চাইছি। প্লিজ বাইকটা নিয়ে তাড়াতাড়ি আসুন।"

এতক্ষণে গলাটা চিনতে পারল শৌর্য। বলল, "আরশি বলছ তো? প্রবলেমটা কী?"

"ভূত! ফাঁকা হোটেল... বেল টিপছি... কেউ আসছে না। আমি আর এক মুহূর্তও থাকতে পারব না এখানে। হয়তো মরেই যাব।"

"কুল, আরশি। ফাঁকা হোটেল বলেই এসব কথা মাথায় আসছে। রুমের দরজা ভাল করে লক করে শুরু পড়ো। কাল সকালে আমি দেখা করছি।"

"দেখা হয়তো হবে না। এই হোটেলে একটা মেয়ে সুইসাইড করেছিল। এখন আমার রুমের বাইরে পায়চারি করছে। সুইসাইডের ভূত আর একজনকে সুইসাইড করতে ডাকে।"

"তোমার মাথা পুরোটাই গিয়েছে! দাঁড়াও, আসছি..." বলে বিছানা থেকে নামল শৌর্য। মনে-মনে বলল, 'মেয়েটা তো জ্বালিয়ে মারল! 'দেওয়াল ঘড়ির দিকে চোখ যায়, সাড়ে চারটে। মাঝরাত নয় তা হলে! বাথরুমের দিকে এগোয় শৌর্য।

লাস্ট কবে এত ভোরে কলকাতার রাস্তায় বাইক চালিয়েছে, মনে পড়ে না শৌর্যর। তাও আবার শীতবিদায়ী ভোর। এখনও আলো ফোটেনি, ভোর আদৌ বলা যায় কি?

বেরনোর আগে মাকে ঘুম থেকে তুলতেই হল। বাড়ির মেন দরজায় ইন্টারলক সিস্টেম। মায়ের ঘুম না ভাঙিয়েই বেরিয়ে পড়া যেত। খানিক বাদে যদি ঘুম ভাঙত মায়ের, শৌর্যকে ঘরে না দেখলে চিন্তা করত খুব।

হাত দিয়ে ঠেলে তুলতেই, ধড়মড় করে উঠে বসতে যাচ্ছিল মা। ঘাবড়ানো গলায় জানতে চাইল, "কী রে, কী হয়েছে?"

"তেমন কিছু না। তুমি শুয়ে থাকো। আমি দরজা লাগিয়ে বেরছি। চিন্তা করবে, তাই জানিয়ে গেলাম।"

মা বলল, "এত রাতে যাচ্ছিস কোথায়?"

"রাত নয়, একটু পরেই ভোর হবে... এক বন্ধুর ফোন এসেছিল, একটু প্রবলেমে পড়েছে," বলে মায়ের ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল শৌর্য, উদ্বেগের গলায় মা জানতে চেয়েছিল, "কোন বন্ধু, কী প্রবলেম?"

"আমার সব বন্ধুকে তুমি চেনো?" বলে বাড়ির মেন দরজার দিকে এগোল শৌর্য।

গ্যারেজ থেকে বাইক নিয়ে রাস্তায় এসেই মনে হল জ্যাকেটটা চাপিয়ে নিলে হত। শুধু টি-শার্টে বেশ শীত-শীত করছে। 'পার্ক সেন্টার' হোটেলে গিয়ে এখন কী পরিস্থিতিতে পড়বে শৌর্য, আন্দাজ করতে পারছে না। মেয়েটা কি অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকবে? নিয়ে যেতে হবে হাসপাতালে? ফালতু ঝামেলা ঘাড়ে এসে পড়েছে। এর জন্য সুমিতদাই দায়ী। মেয়েটাকে যখন পছন্দ নয়, না

বলে দিলেই পারত। তা না, মেয়েটাকে তার 'চেনা চেনা' লাগছে! চোখের বাইরে চলে গেলে মনেই পড়বে না কোথায় দেখেছে! প্রবল অস্বস্তিতে ভুগবে!

ভুগতে হচ্ছে তো, শৌর্যকে। সুমিতদার আর কী? সিলেক্টেড নয় জেনে গেলে আরশি হয়তো রাতের ট্রেন ধরে নিত। সেই মতো রিজার্ভেশন করা ছিল নিশ্চয়ই। চান্স পাবেই ধরে নিয়ে কেউ তো আর একবারের জন্য চলে আসে না। ফেরার ব্যবস্থা রাখে। এই মেয়েটা আবার কলকাতায় প্রথম। কোনও আত্মীয়স্বজন নেই। অথবা আছে, সম্ভাব নেই। বোঝাই যাচ্ছে, ওই হোটেলে আর থাকবে না আরশি। শৌর্য ওকে নিয়ে কোথায় যাবে? তার চেয়েও একটা বড় দুশ্চিন্তা মনের কোণে উঁকি মারছে, মেয়েটাকে গিয়ে যদি অজ্ঞানের থেকেও খারাপ অবস্থায় পাই, বিচ্ছিরিভাবে ফেঁসে যাব। থানা-পুলিশ, খবরের কাগজ, টিভি... কিছুই বাদ থাকবে না!

ঢাকুরিয়া ব্রিজের উপর উঠে পড়ল শৌর্য। একবার মনে হল, হোটেলটায় যাওয়ার দরকার নেই। গোলপার্ক আইল্যান্ডটা পাক দিয়ে আবার ব্রিজে চলে আসবে, ফিরে যাবে বাড়ি। যেচে বিপদে পড়ার কোনও মানে হয় না। পরক্ষণেই চিন্তা অন্য খাতে বইতে থাকে, মনের চোখে ভেসে ওঠে আরশির অসহায় মুখ। মেয়েটা যেমন দুষ্টু, ততটাই ভিতু। এখনও যেন কিশোরী বয়স পার করেনি। মা-বাবাকে ছেড়ে একা এতদূরে এসেছে, নিজের লোক বলতে এ শহরে কেউ নেই। মা-বাবা অদ্ভুত, কোন আক্কেলে একা ছেড়েছে মেয়েটাকে! রীতিমতো সুন্দরী মেয়ে সে... চিন্তাগুলোই 'পার্ক স্টোর' হোটেলের সামনে এনে ফেলল শৌর্যকে।

নাঃ, বড় অঘটন কিছু ঘটেনি। হোটেলের কাচের দরজায় দু'হাতের তালু রেখে দাঁড়িয়ে আছে আরশি। দরজার লক খুলে দেওয়ার মতো কাউকে পায়নি। কাচের দরজার আগে কোল্যাপসিবল্ গেট। তাতেও তালা।

বাইক স্ট্যান্ড করে দরজার সামনে যায় শৌর্য। যা ভেবেছিল তাই, পিঠে রুকস্যাকসহ আরশি ইশারায় দেখাচ্ছে লক খুলে দেওয়ার কেউ নেই। আঙুল তুলছে রিসেপশন কাউন্টারের পাশে বন্ধ দরজার দিকে। তারপর হাত আর মুখের ভঙ্গিতে বোঝাল ওই ঘরে কেউ ঘুমোচ্ছ, যার কাছে চাবি আছে। কাচের বন্ধ দরজার বাইরে কথা আসবে না, তাই ইশারাই সম্বল।

হাত তুলে আরশিকে শান্ত থাকার নির্দেশ দিল শৌর্য। ট্র্যাকসুটের লোয়ার থেকে বের করল মোবাইল, কাচের দরজায় বড় করে লেখা হোটেলের নাম, ফোন নম্বর। নম্বরটা দেখে মোবাইল থেকে কল করল। বেজে উঠল রিসেপশন কাউন্টারের ফোন। শৌর্য শুনতে পাচ্ছে নিজের ফোনে। আরশি ঘুরে তাকাল কাউন্টারের দিকে। বেজে যাচ্ছে ফোন। অবশেষে খুলে গেল আরশির দেখানো সেই রুমটার দরজা। ঘুম চোখে বেরিয়ে এল রিসেপশনের লোকটা, পরনে গেঞ্জি আর লুঙ্গি। কাউন্টার থেকে তুলে নিল ফোনের রিসিভার, "গুড মর্নিং, হোটেল পার্ক স্টোর।"

কথার ধরন দেখে বোঝা যাচ্ছে নিশ্চয়ই করা যাবে না, লোকটা লুঙ্গি পরে আছে! শৌর্য বলে, "ভেরি গুডমর্নিং। গেটটা খুলুন।"

লোকটা দরজার দিকে তাকায়। অবাক হলেও তাড়াতাড়ি সামলে নেয় নিজেকে। হাতের ইশারায় জানায় আসছে। ফিরে যায় নিজের রুমে। কাচের ওপারে নানা অঙ্গভঙ্গি করছে আরশি, মানেটা দাঁড়াচ্ছে এই রকম, 'আশ্চর্য লোক! আমি কত ডাকলাম, কিছুতেই উঠল না।'

হাতে চাবি নিয়ে ফিরে এল লোকটা। প্রথমে কাচের দরজার তালাটা খুলল, তারপর কোল্যাপসিব্‌ল গেটের।

ভিতরে পা রেখেই মেজাজ দেখানো শুরু করল শৌর্য, "কী ব্যাপার, বোর্ডার এত করে ডাকছে, দরজা খোলেননি কেন? যেই ফোন করলাম, কাস্টমার আসবে ভেবে উঠে এলেন। খালি বিজনেসের চিন্তা, তাই না?"

লোকটা একটু কাঁচুমাচু হল বটে, তবে উত্তর দিতে থাকল স্পষ্টভাবে। বলল, "ওঁর ডাক আমি শুনেছি। দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলছিলেন, 'গেট খুলে দিন। আমি বেরিয়ে যাব। আমার ভীষণ ভয় লাগছে।' ভয় লাগার কী আছে, কিছুই বুঝলাম না। মনে হচ্ছিল দিদিভাই একটু অন্যরকমের, বড়লোকের খেয়ালি ধরনের মেয়ে। রাত শেষ হয়নি, গেট খুলে দিই যদি, কোথায় গিয়ে কোন বিপদে পড়বে, দোষ হবে আমার।"

লোকটা বিবেচনার কাজ করেছে, শৌর্য তাই কিছু বলতে পারে না। আরশি লোকটাকে বলে, "আমি যে রুম থেকে বারবার বেল টিপে যাচ্ছিলাম, তখন কেন আসেননি? এলে ভয় হয়তে একটু কাটত। চলে যাওয়ার কথা বলতাম না।"

"বেলটা খারাপ হয়ে আছে দিদিভাই। ইলেকট্রিশিয়ানকে কবে থেকে ডাকছি, আসছেই না।"

"বেলটা খারাপ হয়ে নেই, খারাপ করে রেখেছেন, যাতে ঘুমের ডিসটার্ব না হয়!" বলার পর আরশি কাঁধের ব্যাগ সামনে এনে কাউন্টার গিয়ে রাখে। ব্যাগের চেন খুলতে-খুলতে বলে, "যাক, ওসব ছাড়ুন। বিল কত হয়েছে বলুন তাড়াতাড়ি।"

লোকটা কাউন্টারের পিছনে যায়। কম্পিউটার অন করে চোখ বোলায় হিসেবে। কি বোর্ডের সুইচ টেপে। প্রিন্টার থেকে বেরিয়ে আসে বিল। সেটা আরশির হাতে দিয়ে বলে, "ভয়টা কী নিয়ে পেলেন বলুন তো?"

পার্স থেকে টাকা বের করতে-করতে আরশি বলতে থাকে, "যে মেয়েটা সুইসাইড করেছিল আপনাদের হোটেলে, একটু খরচা হলেও তার শ্রাদ্ধশান্তি করুন। রাত হলে হোটেলের বারান্দায় ঘুরে বেড়ায় সে।"

টাকা হাতে নিয়ে আরশির দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল লোকটা। তাতে আরশির ভ্রূক্ষেপ নেই। ব্যাগ পিঠে নিয়ে শৌর্যকে বলে, "চলুন। বাজে হোটেল একটা। এই ভূতুড়ে হোটেলের নাম লিখে ফেসবুকে স্টেটাস দেব আমি। লোকে যেন না ওঠে এখানে।"

বাইরে চোখের পাতা সামান্য খুলেছে কলকাতা। না খুলে উপায় আছে! পাখিদের যা চেঁচামেচি! কিছু মানুষ ইতিমধ্যেই বেরিয়ে পড়েছে মর্নিংওয়াকে। পার্কের পাশে খুলে গিয়েছে চায়ের দোকান। গাছের নীচে সেই দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে শৌর্য আর আরশি। দুটো চায়ের অর্ডার করে শৌর্য আরশিকে জিজ্ঞেস করেছে, "এবার কোথায় উঠবে?"

মাথা নিচু করে ভেবে চলেছে আরশি। ডান হাতের বুড়ো আঙুল দাঁতে। শৌর্য ফের বলে, "কী হল, কোথায় উঠবে এখন?"

"মাথায় আসছে না তো। তেমন কোনও জায়গা থাকলে কি হোটেলে উঠতাম?"

"তার মানে আবার একটা হোটেলেই উঠতে হবে এবং তোমাকে বাইকে বসিয়ে সেটা খুঁজতে হবে আমায়!" বলল শৌর্য।

আরশি বলে, "এখন আবার সব হোটেলের দরজা বন্ধ। ডেকে তোলো, রুম পাওয়া যাবে কি না জিজ্ঞেস করো, হাজার ঝামেলা।"

"লিজিয়ে আপলোগো কা চায়ে," বলল দোকানদার। ফের জিজ্ঞেস করল, "বিস্কিট লেঙ্গে?"

"আমার লাগবে না," বলল শৌর্য। আরশি বলল, "আমারও না।"

দু'জনেই চায়ের ভাঁড় নিয়েছে হাতে। চুমুক মেরে আরশি বলে, "দারুণ করেছে চা-টা! এই সময়ে খেতে যা লাগছে না, টেরিফিক!"

হোটেলের লোকটা ঘুরিয়ে উচিত কথাই বলেছে, মাথায় ছিট আছে মেয়েটার। কোথায় উঠবে ঠিক নেই, চায়ের আমেজ নিচ্ছে! শৌর্যকেই ঠিক করতে হবে কোথায় নিয়ে যাবে একে। অন্য কোনও হোটেল দেখতে হবে। নিবেদিতাকে বলে দেখা যেতে পারত, আরশিকে রাখবে কি না। মেয়েটাকে পছন্দ হয়েছে ওর। কিন্তু নিবেদিতা ন'টার আগে ঘুম থেকে ওঠে না। ফোন খোলে তারও পরে। পেয়িংগেস্ট হিসেবে থাকে এক বাড়িতে। সেখানে মেয়েটাকে রাখার অনুমতি পাবে কি না, কে জানে!

দু'জনেরই চা শেষ। ভাঁড়ও ফেলা হয়ে গিয়েছে। দাম মেটাল আরশি। শৌর্য বলল, "হোটেল ছাড়া আর কোনও গতি নেই দেখছি। চলো, এখন হোটেল খুঁজতে থাকি।"

"চট করে পাওয়া যাবে না। আমি তো দেখলাম, একলা মেয়েকে থাকতে দিতে চায় না হোটেলগুলো। তার চেয়ে একটা সিম্পল সলিউশন বলি?"

"বলো।"

"আমাকে আপনার বাড়িতে নিয়ে চলুন।"

রীতিমতো হোঁচট খায় শৌর্য। বলে, "আমাকে চেনো না, জানো না, আমার বাড়িতে গিয়ে উঠবে? মনে এতটুকু ভয় নেই তোমার!"

"আপনাকে তো কাল থেকে দেখছি। দেখা হওয়ার পর থেকে সাহায্য চেয়ে জ্বালিয়ে মারছি। একবারও মুখ ঘুরিয়ে নেননি। কোন দুঃখে আপনাকে ভয় পাব? তবে হ্যাঁ, আপনি যদি বিয়ে করে থাকেন, আপনার স্ত্রী হয়তো আমাকে থাকতে দিতে রাজি হবেন না। তবে মনে হয় না বিয়ে হয়েছে আপনার। এত অল্প বয়সে কোনও বুদ্ধিমান ছেলে বিয়ে করে না। আপনাকে আমার বোকা মনে হয়নি।"

"ধন্যবাদ, বোকা না ভাবার জন্য। কিন্তু আমার মা তো আপত্তি জানাতে পারে তোমার থাকার ব্যাপারে। বাড়িটা মায়েরও।"

"আমার মনে হয় না আপত্তি করবেন আপনার বাবা-মা। যাঁরা নিজের ছেলেকে এরকম সুশিক্ষায় মানুষ করেছেন, যে-ছেলে পরের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাঁরা কেন আমার সমস্যা বুঝবেন না!"

শৌর্যর বুঝতে অসুবিধে হয় না আরশির তোষামুদি। আবার কথাগুলো যে একেবারে যুক্তিহীন, তাও বলা যায় না। বাবার কথাটা এনে ফেলল বলে মনটা নরম হল আরশির। হোটেলে না তুলে আরশিকে বাড়ি নিয়ে গেলে খুশিই হত বাবা। এক্ষেত্রে মা-ও আপত্তি তুলবে না। তবে ট্যাক্টফুলি বুঝে নেবে আরশির অসহায়তা কতটা জেনুইন!

"এত চিন্তা করছেন কেন? রাতে তো থাকছি না। দুপুরে রেজাল্ট জানার পর প্রথম ভলভো বাসটা ধরে ফিরে যাব। যদি সিলেক্টেডও হই, শুটিং তো আর কাল থেকেই শুরু হয়ে যাবে না। গার্লফ্রেন্ডের কাছে জবাবদিহি করতে হবে না আপনাকে।"

"হঠাৎ গার্লফ্রেন্ডের কথা এল কেন এখানে?" সবিস্ময়ে জানতে চায় শৌর্য।

আরশি বলল, "এত কম চেনা একটা মেয়েকে বাড়িতে নাইট স্টে করতে দিলে আপনার গার্লফ্রেন্ড রাগ করতেই পারে। আমি হলেও করতাম।"

কপট উষ্মাসে শৌর্য বলে ওঠে, "গুড আইডিয়া! চলো গার্লফ্রেন্ডের বাড়িতেই নিয়ে যাই তোমাকে।"

শৌর্য হাত বাড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিল আরশির কনুই, আরশি পিছিয়ে যেতে-যেতে বলল, "অ্যাই, না না। আপনার গার্লফ্রেন্ডের বাড়িতে উঠব না আমি। সেটা ঠিক হবে না। প্রচুর জেরার মুখে পড়তে হবে আমাকে।"

"আরেঃ, যাইয়ে না, কুছ নেহি হোগা!" মজা পেয়ে বলে উঠল চাওয়ালা। কথাগুলো শুনে বলল, নাকি না শুনে, বোঝা গেল না। শৌর্য ততক্ষণে ধরে নিয়েছে আরশির কনুই, বাইকের কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, "যাবে তো চলো। না হলে দাঁড়িয়ে থাকো এখানেই।"

এখন চারপাশ অনেকটাই পরিষ্কার। আরশি চলেছে শৌর্যের বাইকে। হাওয়ায় চোরা শীত। দু'জনের মাথাতেই হেলমেট নেই। আরশি জিজ্ঞেস করেছিল, "হেলমেট পরতে হবে না?" শৌর্য বলল, "এত ভোরে ট্র্যাফিক রুল অনেক লুজ থাকে। তা ছাড়া আমি সাবধানেই চালাই। তুমি পরতেই পার।"

"ধুর, হেলমেট আমার একেবারে যাচ্ছেতাই লাগে! মাথায় যেন ব্যান্ডেজ বাঁধা... আশপাশটা ভাল করে দেখা যায় না," বলেছিল আরশি। শৌর্য কিন্তু সত্যিই সাবধানে চালাচ্ছে বাইক। রাস্তা ফাঁকা তবু স্পিড তুলছে না। খানিক আশঙ্কার গলায় আরশি জানতে চায়, "আপনি কি সত্যিই আমাকে প্রেমিকার বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন?"

"তাই তো বললাম।"

"আপনার প্রেমিকা যদি আমাকে না থাকতে দেয়?"

"তখন পারমিশন চাইব, তোমাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার।"

শৌর্যর দু'কাঁধ ধরে বসেছে আরশি, এক কাঁধে আলতো কিল মেরে বলে, "এবার বুঝেছি, আপনি ইয়ার্কি মারছেন!"

শৌর্য মিচকি হাসে। আরশি পিছনে বসেও শৌর্যর হাসিমুখটা কল্পনা করতে পারে। এগিয়ে চলেছে বাইক। আরশি বলে ওঠে, "আপনি কী পারফিউম মেখেছেন? দারুণ গন্ধ!"

"ভোরবেলা পারফিউম মেখে বেরিয়েছি, তাও আবার একটা মেয়েকে ভূতে ধরেছে শুনে!" হাসতে-হাসতে বলে ওঠে শৌর্য।

আরশি বলে, "অ্যাই, না। আমি কিন্তু সিরিয়াস! গন্ধটা আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকেই পাচ্ছি। আর একটা ব্যাপার। গন্ধটা কেমন যেন চেনা-চেনাও লাগছে।"

"চেনা!" বলে চুপ করে গেল শৌর্য। একটু ভেবে নিয়ে বলে, "এখন পাচ্ছ?"

"না, এই মুহূর্তে পাচ্ছি না। একটু আগেও পেয়েছিলাম। আসলে গাড়ি চালাচ্ছন তো, হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে গন্ধ।"

"যখন আমরা চা খাচ্ছিলাম, তখন সবচেয়ে বেশি করে পেয়েছিল, তাই না?"

"হ্যাঁ, আপনি কী করে বুঝলেন?"

"ওটা আমের মুকুলের গন্ধ। চাওয়ালার পিছনে পার্কে একটা আম গাছ ছিল। রাস্তাতেও অনেক আম গাছের পাশ দিয়ে এসেছি আমরা। এখন মুকুল এসেছে গাছগুলোয়।"

"ঠিক বলেছেন তো! তাই এত চেনা লাগছিল গন্ধটা। আমার মামার বাড়ি মালদায়। ছোটবেলায় খুব যেতাম। স্মৃতিগুলো যদিও ঝাপসা, গন্ধটা মনে আছে। আমাদের কলেজের পিছনেও আছে,

দুটো ঝাঁকালো আমগাছ। এই গন্ধটা পেয়েছি। তবে এটা যে আমের মুকুলের গন্ধ, তা জানতাম না।''

সুলেখা স্টপ পেরিয়ে গেল শৌর্য, এরপরই তাদের পাড়ায় ঢোকার রাস্তা। মানে যাদবপুরের সেন্ট্রাল পার্ক। শৌর্যদের পাড়াতেও আছে বেশ ক'টা আমগাছ। শৌর্যর ছোটবেলায় আরও ছিল। গন্ধটা তাই ভাল করেই চেনে।

বাড়ির গেটে বাইক থামাল শৌর্য। আরশিকে বলল, ''নামো, আমাদের বাড়িতেই নিয়ে এলাম। দ্যাখো, কপালে কী আছে তোমার!''

''আমি শিওর, কপালে ভাল কিছুই লেখা আছে!'' বাইক থেকে নেমে এসে বলল আরশি।

গেট খুলে বাইক ঢোকায় শৌর্য, বাগানেই স্ট্যান্ড করে রাখে। গ্যারেজে নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই। দশটা নাগাদ তো বেরতেই হবে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে রূপরেখা অ্যাড এজেন্সিতে।

ডোরবেল বাজায় শৌর্য। দরজা খোলে মা, ভীষণ অবাক হয়েছে আরশিকে দেখ। শৌর্য বলে, ''এই হল আমার বন্ধু। বেশি দিনের নয় সদ্যই আলাপ। এর জন্যই বেরিয়েছিলাম। বাকিটা ওর থেকে শুনো। ঘুম কমপ্লিট হয়নি আমার। শুতে যাচ্ছি। নিজে থেকে না ওঠা অবধি ডেকো না।''

আরশি এগিয়ে গিয়ে অপর্ণার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলে, ''আমার নাম আরশি। জলপাইগুড়িতে বাড়ি। এখানে...''

''এসো, বাকিটা ভিতরে বসে শুনব...'' আরশির কথা কেটে ডেকে নেন অপর্ণা। মেয়েটাকে বড়ে পড়া পাখির মতো লাগে তার।

বেশ একটা জমাট ঘুম হল শৌর্যর। উঠে বসে বিছানায়। চোখ গেল দেওয়ালঘড়িতে। খুব বেশি তো ঘুমোয়নি। আটটা বাজে, মানে মাত্র দেড়ঘণ্টা। তাতেও মনে হচ্ছে সম্পূর্ণ হল ঘুম। আরশি কী করছে, কে জানে! ও-ও নিশ্চয়ই ঘুমোচ্ছে। ওর তো আর ঘুম হয়নি রাতে।

বিছানার পাশে মেঝেতে রাখা জলের বোতল তুলে নিল শৌর্য। জল খেয়ে বোতল নামিয়ে রাখতে গিয়ে একটা আইডিয়া এল মাথায়, আরশিকে লুকটেস্টের রেজাল্ট জানিয়ে দেবে। সুমিতদার ভুলভাল খেয়ালের জন্য ওকে আটকে রাখার কোনও মানে হয় না। দিনের দিন যদি কোনও ট্রেনের রিজার্ভেশন পাওয়া যায়, তো ভালই। ময়তো ভলভো বাসে যাবে পছন্দমতো সিট বুক করে। যত বেলা হবে, ভাল সিট পাবে না। গোটা ব্যবস্থাটাই অনলাইনে করে দেবে শৌর্য। সুমিতদা এক সময় হয়তো জানতে পারবে, শৌর্য মেয়েটার বাড়ি ফেরার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল। তখন যদি কিছু বলে সুমিতদা, শৌর্য জানিয়ে দেবে কী-কী ঝামেলায় পড়েছিল আরশিকে নিয়ে। সমস্যা একটাই, মেয়েটা কত আশা করে বসে আছে, সিনেমায় চান্স পাবে, পায়নি শোনার পর ভেঙে পড়বে খুব। সান্ত্বনা দিতে হবে শৌর্যকে। এই সান্ত্বনা দেওয়াটা যথেষ্ট কঠিন কাজ। জীবন অভিজ্ঞ মানুষরাই এসব সামলাতে পারে। এর জন্য কিছু নির্দিষ্ট ডায়ালগ এবং বিশেষ স্বরক্ষেপণ লাগে, যা শৌর্যের আয়ত্তের বাইরে। মা-কে দিতে হতে দায়িত্বটা।

বিছানা থেকে নেমে আসে শৌর্য। বাথরুম যাবে বলে ঘর থেকে বেরয়। কানে আসে আরশির গলা, বারান্দায় দাঁড়িয়ে ফোনে কারও সঙ্গে কথা বলছে। কার সঙ্গে? সাধারণ কৌতূহলে ড্রয়িং লাগোয়া বারান্দার দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় শৌর্য, আরশি এখান দিয়েই গিয়েছে বারান্দায়, খোলা আছে দরজা। ফোনের অপরপ্রান্তকে আরশি বলছে, ''খুব বেশি খবর নেওয়ার তো নেই। ভাল পড়ানোর জায়গা তো মোটে চারটে। মনে হচ্ছে যেদিন ফেরার কথা, তার আগেই ফিরে যেতে পারব। ... কী বলছ? রিজার্ভেশন পাবে না? ...তা হলে ভলভো ধরে নেব। ... না, না, পূর্বা অফিস নিয়ে একটু প্রবলেমে আছে। আমার সঙ্গে ঘুরে বেড়ানোর মতো সময় ওর নেই। একটু বোধহয় আপসেটও আছে গোটা বাড়ি। এখানে বেশিদিন থাকা ঠিক হবে না। আমি বাসেই চলে যাব। ... কী বলছ? ফ্লাইট? কী দরকার অত টাকা খরচ করার! আমি শুনেছি ভলভো বাসে কোনও কষ্ট হয় না।

তুমি আবার পূর্বাকে অফিস নিয়ে কিছু বলতে যেয়ো না। এতটাই ডিসটার্বড আছে, উত্তর দিতে ভাল লাগবে না ওর...'' দরজার পাশ থেকে সরে আসে শৌর্য। মেয়েটা তো সাংঘাতিক মিথ্যুক! যার সঙ্গে কথা বলছে, তাকে তো মিথ্যে বলছেই, শৌর্যকেও সব সত্যি বলেনি। অথচ এমন অ্যাক্টিং করছে, যেন কত সহজ সরল মেয়ে। ইউনিটের কারা যেন বলছিল আরশি অন্য মেয়েটার থেকে অভিনয়ে পিছিয়ে! সম্পূর্ণ ভুল। মারাত্মক অভিনেত্রী আরশি। অস্কার ওর জীবনে বাঁধা।

বিশ্বাস করে কেউ যদি ঠকে যায়, যে মানুষটা ঠকিয়েছে তার উপর ভীষণ রাগ হয়। কিন্তু বাড়িতে রাগ দেখালে চলবে না। চেঁচামেচি করে যদি আরশিকে বাড়ি থেকে বের করে দেয় শৌর্য, মা ঘাবড়ে যাবে। ছেলের বুদ্ধি-বিবেচনার উপর থেকে উঠে যাবে ভরসা। মায়ের কাছে আরশিকে রেখে বেরনোও ঠিক হবে না। এ মেয়ে এখন শৌর্যর কাছে অচেনা। ফোনের কথা শুনে মনে হচ্ছিল বাবা অথবা মায়ের সঙ্গে কথা বলছে। স্থানীয় কোনও অভিভাবকও হতে পারেন। তাঁকে বলে আসেনি যে অডিশন দিতে এসেছে। অন্য অজুহাত দেখিয়েছে। যে হাসতে-হাসতে নিজের গার্জেনকে এতবড় মিথ্যে বলতে পারে, পরের মাকে পট্টি পরাতে তার বাধবে না। মাকে মিথ্যে বলে ঠিক কী ধরনের ক্ষতি করবে, আন্দাজ করা যাচ্ছে না। আজ ভোরে শৌর্যকে সে সত্যিটা বললেই পারত। রেক্লাল্ট জানার পর চলে তো যাবেই। গত সন্ধেয় যদি বলত বাড়িতে না জানিয়ে অডিশন দিতে এসেছে, শৌর্য অবশ্যই বলত, 'এক্ষুনি বাড়িতে ফোন করে আসল উদ্দেশ্যটা জানাও। নয়তো হোটেলে দিয়ে আসব না আমি। কোনও অঘটন ঘটলে দায় চাপবে আমার উপর...' রাতটা যখন ভালমন্দ মিশিয়ে কেটে গেল, ভোরবেলা অত মিষ্টি-মিষ্টি কথাগুলো বলার কী দরকার ছিল? আসল কথাটা প্রথমেই বলে নিলে হত। না, এ মেয়েকে যত তাড়াতাড়ি বিদায় দেওয়া যায়, ততই মঙ্গল।

বাথরুম থেকে ঘুরে এসে রোজকার মতো ডাইনিং টেবিলে বসেছে শৌর্য। খবরের কাগজ ওলটাচ্ছে। এখনই চা নিয়ে আসবে মা। নিজের জন্যও আনবে।

''আপনার চা?'' আরশির গলা।

সামনে থেকে কাগজ সরায় শৌর্য। আরশির হাসি-হাসি মুখটা দেখে রাগ হয়ে যায় ভীষণ। তবে এখনই, মানে বাড়িতে চোটপাট করলে চলবে না। সিন করবে আরশি। এতই বিশ্বস্ত অভিনয়, মা ওর পক্ষ নিয়ে নেবে। শৌর্য বলে, ''মা কোথায়?''

''মাসিমা কিচেনে... আমাকে বললেন চা-টা দিয়ে আসতে, আমরা খেয়ে নিয়েছি চা,'' বলে মুখোমুখি চেয়ারে বসল আরশি। চায়ের মগে চুমুক দিয়ে শৌর্য বলল, ''পারফেক্ট বাংলা টিভি সিরিয়ালের দৃশ্য। ভোরবেলা প্রায় অচেনা মেয়েকে এনে তুললাম বাড়িতে। মায়ের মন জয় করে নিল সে। ভাবী বউমা বলে গণ্য করে মা তার হাত দিয়ে চা পাঠাল!'

''দারুণ বলেছ তো! মাসিমার সত্যিই আমাকে খুব পছন্দ হয়েছে। কত গল্প করলেন। পিছনের বাগানে ফুল তুললাম দু'জনে। কিন্তু এরপরই যে সিরিয়ালে দেড়-দু'মাস জুড়ে ভাবী শ্বশুরবাড়ির লোক নানা বায়নাক্কা করবে। কষ্ট দেবে নায়িকাকে। সেগুলোও কি চলবে?''

''অত লম্বা অপেক্ষা তোমায় করতে হবে না, যা ঘটার, খুব তাড়াতাড়িই ঘটে যাবে!'' বলে ফের চায়ে চুমুক দিল শৌর্য।

''কী ঘটবে গো? এত তাড়াতাড়িই বা কীসের?'' প্রগল্‌ভতার আড়ালে সংশয় যেমে জানতে চাইল আরশি।

''তাড়াতাড়ি হবে না? তোমারও তো গোটা দিনও লাগল না 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নামতে।''

লজ্জা পেল আরশি। সবটাই অবশ্য ভান। বলে ওঠে, ''আচ্ছা, তোমার বাবা নেই, একবারও তো বলোনি!''

''বলার মতো প্রসঙ্গ তো আসেনি। তা ছাড়া আমার বাবা নেই জেনে তোমার সুবিধে বা অসুবিধেটা কী হবে?''

''মাসিমার মুখ থেকে শুনতে ভীষণ খারাপ লাগছিল আমার। কীভাবে চলে গেলেন সেটাও শুনলাম। খুবই প্যাথেটিক। মেসোমশাইয়ের ফোটো দেখলাম, তোমার মুখের সঙ্গে ভীষণ মিল।''

কোনও উত্তর দেয় না শৌর্য। চা খেতে থাকে। সমবেদনা দেখিয়ে এ বাড়ির দুই মেম্বারের আস্থা অর্জন করতে চাইছে মেয়েটা। ফের আরশি বলে, ''আমারও মা নেই জানো।''

'কী ভাবে মারা গিয়েছেন' জানার কোনও ইচ্ছে নেই শৌর্যর। সত্যিই মা নেই, নাকি এটাও মিথ্যে, তাই বা কী করে বুঝবে? একবার কারও উপর থেকে বিশ্বাস চলে গেলে, তা আর ফেরে না। শৌর্য সরাসরি অন্য প্রসঙ্গে যায়। বলে, ''রেডি হয়ে নিয়ো, দশটা নাগাদ বেরব। এখনই সাড়ে আটটা।''

''আমি এত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে কী করব! প্রোডাকশন থেকে আসতে বলেছে তো দুপুর দুটোয়। তোমার যদি অন্য কাজ থাকে বেরিয়ে পড়তে পারো। তোমাদের বাড়ি থেকে সময় মতো বেরিয়ে আমি ট্যাক্সি ধরে নেব। ট্যাক্সিওলাকে গোলপার্ক বললেই তো হবে। তারপর আমি চিনে নিতে পারব।''

''না, আমার সঙ্গেই বেরতে হবে তোমাকে। কাজ আছে।''

''কী কাজ?'' জানতে চায় আরশি।

শৌর্য উত্তর না দিয়ে কাগজটা তুলে পড়ার ভান করে। আরশি একটু অভিমানী গলায় বলল, ''বুঝেছি। কেন তুমি আমায় সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইছ।''

''কেন?'' শৌর্যর স্বরে কৌতূহল।

আরশি বলে, ''মাসিমাও তো সাড়ে দশটা নাগাদ বেরিয়ে যাবে কলেজে। তখন বাড়িতে আমি একা। যদি আলমারি ফাঁকা করে পালাই। এটাই ভাবছ তুমি।''

সেন্টিমেন্টের খেলা খেলছে আরশি। বেশি এগোতে দেওয়া যাবে না। শৌর্য বলে ওঠে, ''কেন উলটোপালটা বকছ! তোমার ট্রেনের রিজ়ার্ভেশনের জন্য বেরব। রেলের বড় এক অফিসারের সঙ্গে চেনাজানা আছে আমার। ডিআইপি কোটায় টিকিট বার করে দিতে পারবেন। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে টিকিটটা কত জরুরি, সেটা বোঝানো সহজ হবে।''

আরশির বোধহয় প্রস্তাবটা পছন্দ হল না। উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে। শৌর্যর ফাঁকা চায়ের মগটা হাতে তুলে নিয়ে বলল, ''দেখি, মাসিমা কী বলেন!''

ছেলেটার উপর এবার একটু সন্দেহ হচ্ছে আরশির। ছেলেটা বলতে শৌর্য আর সন্দেহ মানে যে সব সময় খারাপ কিছু ঘটবে, তা নয়। কিছু একটা ঘটতে চলেছে, সেটা একদম নিশ্চিত। কথা ছিল শৌর্য টিকিটের জন্য রেলের এক অফিসারের কাছে নিয়ে যাবে। যেহেতু আজ উইকডে, অফিসারকে অফিসেই পাওয়ার কথা। শৌর্য এখনও রেলের কোনও অফিসে নিয়ে যায়নি। আরশিকে বাইকে বসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল অ্যাড এজেন্সির অফিসে। সেখানে শৌর্যর নিজের কী একটা কাজ ছিল, আরশি বসেছিল ভিজিটার্স এরিয়ায়। একঘণ্টার মধ্যে কাজ সেরে শৌর্য

আরশিকে বাইকে বসিয়ে নিয়ে এসেছে প্রিন্সেপ ঘাটে। বাইকটা রেখেছে বাইরে, পার্কিং লটে। এই ঘাটের নাম আগে শুনেছে আরশি। বাংলা সিনেমা বা মিউজিক ভিডিয়োতেও দেখেছে। কিন্তু চোখের সামনে দেখাটা একেবারে অন্য অনুভূতি! দেখার অবশ্য বিশেষ কিছু নেই, স্থাপত্য তেমন জাঁকজমকপূর্ণ নয়। সুন্দর বাগানের মাঝে রহস্যময় এক বারান্দা। খানিক দূরে সেকেন্ড হুগলি ব্রিজটাকে যেন বড় উদ্ধত মনে হচ্ছে।

শৌর্য কিন্তু প্রিন্সেপ ঘাটে ঢোকার সময়ও বলেনি জায়গাটার নাম। বোর্ড থেকে জেনে নিতে হয়েছে আরশিকে। বারান্দা-বাগান ছেড়ে নিয়ে আরশিরা এখন বসছে ঘাটের সিঁড়িতে। আরশি নিজের সিদ্ধান্তে কিছু করছে না, অনুসরণ করে যাচ্ছে শৌর্যকে। দ্বিতীয় দফার ঘুম সেরে ওঠার পর থেকেই শৌর্য কেমন যেন বদলে গিয়েছে। ট্যারাবাঁকা কথা শোনাচ্ছিল বাড়িতে। আরশিকে বিদ্রূপ করতে পারলেই যেন বাঁচে। কিন্তু আরশির তো এত তাড়াতাড়ি বিদেয় হওয়ার ইচ্ছে নেই। এক-দুটো দিন থেকে মাকে খোঁজার কাজটা এগিয়ে রাখতে পারলে ভাল হত। সিনেমার জন্য যদি সিলেক্ট না হয়, খোঁজার এই সুযোগটুকুও হারাবে। শৌর্যর মা তাকে থেকে যেতে বললেন ভেবে, আরশি গিয়েছিল ওঁর কাছে। বলল শৌর্য তাকে দশটার সময় বেরতে বলছে। কেন বলছে, সেটাও জানাল। আরশির প্রত্যাশামতো মাসিমা বললেন না 'আজই যাওয়ার কী দরকার? একটু রেস্ট নিয়ে কাল-পরশু যেয়ো।' বদলে ছেলেকেই সমর্থন করলেন। বলেছিলেন, "শৌর্যর যখন তুমি গেলে টিকিট পেতে সুবিধে হবে, তা হলে যাওয়াই ভাল। দুপুরে এসে স্নানখাওয়া সেরে রেক্সান্ট জানতে যেয়ো।"

মাসিমার কথা অনুযায়ী লাগেজ না নিয়ে বাড়ি থেকে বেরছিল আরশি। শৌর্য তখন গেটের কাছে বাইকে বসে পড়েছে। খানিক ধমকের সুরে আরশিকে বলল, "কী হল, ব্যাগ নিলে না! যাও নিয়ে এসো।"

মাসিমার দিকে তাকিয়েছিল আরশি। উনিই লাগেজ না নেওয়ার কারণটা বললেন। শৌর্য বলল, "না, না, ওর জিনিসপত্র সব নিয়ে বেরিয়ে পড়ুক। টিকিট পেতে কতক্ষণ লাগবে, বোঝা যাচ্ছে না। তারপর অডিশনের রেক্সান্ট জানতে আসতে হবে। বিকেলের ট্রেনের যদি টিকিট হয়, এ বাড়িতে আসার সময় হবে না।"

অগত্যা পিঠে ভারী ব্যাগটা চাপিয়ে ঘুরতে হচ্ছে আরশিকে। রেলের অফিসে না গিয়ে গঙ্গার ঘাটে আসার কারণটাও এখনও অবধি স্পষ্ট হল না। এত গুম মেরে আছে শৌর্য, কিছু জিজ্ঞেস করতে ভয় করছে। সিঁড়িতে বসে সিগারেট খেতে-খেতে এমনভাবে দ্বিতীয় হুগলি সেতুটাকে দেখছে শৌর্য, যেন সরকার থেকে তাকে নির্মাণের ত্রুটি দেখতে পাঠানো হয়েছে। গলা ঝাঁকি দিয়ে আরশি বলেই ফেলে, "আমরা এখানে এলাম কেন?"

আরশির দিকে মুখ ফেরায় শৌর্য। বলে, "তোমার কী মনে হয়?"

"দু'টো সম্ভাবনা মাথায় আসছে। প্রথমটা হল, আজ তো ফিরেই যাব, ট্রেনে অথবা বাসে। যাওয়ায় আগে কলকাতার একটা দ্রষ্টব্যস্থান দেখাতে নিয়ে এসেছ। জায়গাটা নিশ্চয়ই তোমার খুব প্রিয়।"

থামল আরশি। শৌর্য জিজ্ঞেস করে, "দ্বিতীয় কারণটা?"

"সেটা মিলবে বলে মনে হচ্ছে না। তবু বলি, তুমি বিশেষ কিছু একটা বলতে চাও আমাকে। যার জন্য এখানে আসতে হয়েছে।"

"বিশেষ কী বলতে পারি বলে মনে হচ্ছে তোমার?"

"লাভ প্রোপোজাল... এরকম সুন্দর পরিবেশে প্রোপোজ না করলে, রিফিউজড হওয়ার চান্স থাকে," খেমে গিয়ে নীচের ঠোঁট উলটে আরশি বলে, "প্রোপোজ তুমি করবে না জানি। সকাল থেকে যা মেজাজ দেখাচ্ছ! কিন্তু একটা ব্যাপার মাথায় ঢুকছে না, টিকিটের ব্যবস্থা করার বদলে তুমি আমায় নিয়ে ঘুরছ কেন? ব্যবস্থা কি হয়ে গিয়েছে ফোনের মাধ্যমে?"

উত্তর না দিয়ে গঙ্গার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল শৌর্য। শেষ হয়ে আসা সিগারেটের টুকরো ফেলে দিয়ে বলল, "কলেজে এখন তোমার কোন ইয়ার?"

"অনার্স ফাইনাল হয়ে গিয়েছে, কেন জিজ্ঞেস করছ?" কৌতূহল প্রকাশ করল আরশি।

শৌর্য বলল, "পরে বলছি। আগে আমার কথাগুলোর উত্তর দাও। তুমি স্টুডেন্ট কেমন?"

"মাঝারির থেকে একটু ভাল। মাস্টার্স করার মতো নাম্বার থাকবে অনার্সে।"

"সিনেমায় চান্স পেলে এবং পরের পর অফার আসতে থাকলে, মাস্টার্স তো করা হবে না।"

"চেষ্টা করব করার। ডিসট্যান্স থেকে হলেও। একান্ত যদি না পারি, তা হলে আর কী করা যাবে। তা ছাড়া এখনই অতদূর অবধি ভাবার কোনও মানে হয় না। আগে চান্সটা পাই।"

"তার মানে লেখাপড়ার চেয়েও সিনেমায় অভিনয় করাটাকে গুরুত্ব দিচ্ছ বেশি। কেন দিচ্ছ? তোমার তো অভিনয়ে কোনও প্রশিক্ষণ নেই। দেখতে সুন্দর বলে নায়িকা হতে চাইছ?"

"'দেখতে সুন্দর' কথাটা এভাবে কেউ বলে, রাগ-রাগ গলায়? যাই হোক কমপ্লিমেন্ট পেয়ে ভাল লাগল। আর সিনেমার নায়িকা হতে কে না চায়!"

"না, সকলেই চায় না। নায়িকাদের চেয়েও অনেক সুন্দর দেখতে মেয়ে চাকরিবাকরি, ঘর-সংসার করছে। এমনকী অনেকের অভিনয়ে দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও নায়িকা হওয়ার পিছনে ছোটেনি। এদিকে তুমি নায়িকা হবে বলে এতটাই মরিয়া, তোমার গার্জেনকে মিথ্যে বুঝিয়ে কলকাতায় চলে এসেছ। তিনি জানেন পূর্বাদের বাড়িতে আছ তুমি। পূর্বাও নিশ্চয়ই চায় না, তুমি সিনেমায় অভিনয় করো, তাই ওদের বাড়িতে ওঠোনি।"

আরশি অবাক হয়ে বলে, "পূর্বাকে তুমি চেনো?"

প্রশ্ন এড়িয়ে শৌর্য বলল, "তোমাকে ট্রেনে তুলে দিতেও এখন ভয় করছে আমার। ধরা যাক সুমিতদার সিনেমায় সিলেক্ট হলে না তুমি। উঠিয়ে দিলাম ফেরার ট্রেনে। দেখা গেল পরের স্টেশনে নেমে পড়ে আবার চলে এলে কলকাতায়। কারণ নায়িকা তোমায় হতেই হবে! ভূত চেপেছে মাথায়। আমার কাছে ফেরার মুখ থাকবে না তোমার। তখন কোন গাজ্জায় গিয়ে পড়বে, কে জানে! বাড়ি থেকে ফোন এলে হয়তো ধরবে না। তাঁদের চোখে নিখোঁজ হয়ে যাবে তুমি।"

"এবার বুঝেছি। বাবার সঙ্গে ফোনে যখন কথা বলছিলাম, তুমি আড়াল থেকে শুনেছ।"

"ভাগ্যিস শুনেছিলাম। নয়তো তোমার স্বরূপ জানতে দেরি হয়ে যেত। গরিব ঘরের অল্পশিক্ষিত স্বপ্নবিলাসী ছেলে-মেয়েরা সিনেমার নায়ক-নায়িকা হওয়ার জন্য এরকম ঝুঁকি নেয়। জেনারেলি ছেলেরাই নেয় বেশি। তুমি সচ্ছল পরিবারের শিক্ষিত মেয়ে হয়ে এই কাজটা করলে! তোমার বাবাকে, আমাকে, আমার মাকে দেদার মিথ্যে বলে চলেছ! যশ-খ্যাতির প্রতি এতটাই লোভ তোমার?"

"সিনেমায় নামার কোনও ইচ্ছে নেই আমার! আমি আমার মাকে খুঁজতে এসেছি কলকাতায়!" একটু চেঁচিয়েই বলে ওঠে আরশি, যা খানিকটা আর্তনাদের মতো শোনায়।

থতমত খেয়ে যায় শৌর্য। বলে, "মানে?"

মাঝগঙ্গায় যে মাছ ধরার নৌকোটা ভাসছিল শৌর্য-আরশির সরাসরি, সেটা এখন সেকেন্ড ব্রিজের নীচ দিয়ে চলে গিয়েছে দূরে। ঘাটের পিছনে রেল লাইনে যাতায়াত করেছে দুটো সারকুলার ট্রেন। অনেক পাখিই ডাকতে-ডাকতে উড়ে গিয়েছ আকাশপথ ধরে। মায়ের ব্যাপারটা বলা হয়ে গিয়েছে আরশির। সব শোনার পর খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে শৌর্য। এখন বলে উঠল, "সেই জন্যই তোমাকে চেনা চেনা লাগছে সুমিতদার!"

"বুঝলাম না," বলে আরশি।

শৌর্য বলল, "তা হলে শোনো, তুমি লুকটেস্টে সিলেক্টেড হওনি। সুমিতদাই ক্যানসেল করেছে। তোমাকে রেখে দিয়েছে কোন সূত্রে চেনা লাগছে সেটা মনে করার জন্য। যদি না মনে পড়ে আজ দুপুর অবধি, তখন তোমার সঙ্গে কথা বলে সূত্রটা জোড়া লাগানোর চেষ্টা করবে।"

"অর্থাৎ মায়ের সঙ্গে আমার মিল খুঁজে পাচ্ছেন সুমিত ঘোষ। যেহেতু বহু বছর আগের কথা, তাই মনে করে উঠতে পারছেন না। কিন্তু মায়ের সঙ্গে তো আমার কোনও মিল নেই। আমি বাবার গড়ন পেয়েছি। বলার পর জিন্সের পকেট থেকে মোবাইল বের করে আরশি। ক্লিনে আঙুল বুলিয়ে নিয়ে আসে মায়ের ফোটো। বলে, "তুমিই দ্যাখো, পুরনো একটা ছবি কপি করে রেখেছি মোবাইলে।"

আরশির ফোন নিয়ে ফোটোটা দ্যাখে শৌর্য। তারপর আরশির মুখের দিকে তাকায়। বারকয়েক এরকম করার পর বলে, "অ্যাপারেন্টলি তো কোনও মিল পাচ্ছি না। সুমিতদা তোমার মাকে ফেস করেছে, ডিরেকশন দিয়েছে গোটা ফিল্ম জুড়ে। সে হয়তো কোথাও একটা মিল পাচ্ছে। ডিরেক্টরের চোখ তো আর পাঁচজনের মতো নয়।"

"সুমিত ঘোষকে কি তা হলে মায়ের কথাটা বলব? সন্ধান দিতে পারবেন বলে মনে হয় তোমার? বাবা যখন খোঁজ নিতে এসেছিল, এড়িয়ে গিয়েছিলেন। সে ভাবে অবশ্য চেপেও ধরেনি বাবা।"

"তুমি যেমনটা মিন করছে, সুমিতদা কিন্তু তেমন মানুষ নয়। তোমার মায়ের নিরুদ্দেশের পিছনে সুমিতদার হাত নেই বলেই আমার বিশ্বাস। সুমিতদাকে অনেকদিন ধরেই কাছ থেকে দেখছি। আমাদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ড। তবে হ্যাঁ, তোমার মায়ের উধাও হওয়ার পিছনে যদি কোনও ক্রাইমের ব্যাপার থাকে, যা হয়তো চাপা পড়ে আছে, সুমিতদা চাইবে না সেটা প্রকাশ্যে আসুক। উধাও ষড়যন্ত্রে সুমিতদা ইনভল্‌ভড না থাকলেও, পুলিশ তাকে ডেকে পাঠাবে, যেহেতু তার ছবি করার পর থেকে তোমার মা নিরুদ্দেশ। পুলিশি ঝামেলা এড়াতে চেয়ে তোমার মায়ের সম্বন্ধে আমাদের কাছে মুখ খুলবে না সুমিতদা। আপাতত সুমিতদাকে কিছু না জানানোই ভাল। অন্য রাস্তায় খোঁজ করতে হবে।"

"কোন রাস্তায়?" জিজ্ঞেস করে আরশি।

"ভাবতে দাও!" বলে শৌর্য আরশির মোবাইল ফেরত দিল।

গঙ্গার ঢল টইটুম্বর। স্রোত ধীরগামী, ঢেউ একেবারেই চঞ্চল নয়। শৌর্যকে সব বলতে পেরে আরশির মনের অবস্থা এখন এই নদীর মতোই স্থিতধী। তার আগে আরশির মন ছিল উত্তরবঙ্গের নদীর অনুসারী, কখনও খরস্রোতা, কখনও বা পাথরের মাঝে ক্ষীণতোয়া। শৌর্য ফোন বের করে কাউকে ডায়াল করছে। কানে নিল ফোন। ওপ্রান্তের কথা শুনে নিয়ে বলল, "ভালই আছি, বিন্দাস! তুমি? ... আমাকে একটা ব্যাপারে হেল্প করবে প্লিজ়... প্রায় ষোলো বছর আগে এক মহিলা অভিনয় করতে এসেছিলেন কলকাতায়, একটা ছবিতে নায়িকাও হন, সে ছবি রিলিজ় করেনি... তারপর থেকে মহিলার আর খোঁজ নেই! ইন্ডাস্ট্রির কোন লোকের কাছে গেলে ওঁর খবর জানা যেতে পারে, বলতে পার? মানে এই লাইনের পুরনো অভিজ্ঞ লোকের কথা বলছি... কী নাম? কোথায় গেলে পাব? ...বাড়ি যেতে হবে? ফোন নাম্বার আছে? ঠিক আছে, এইটুকুই যথেষ্ট, আমি দেখে নিচ্ছি... থ্যাঙ্ক ইউ গৌতমদা, পরে আবার কথা হবে..." ফোন কাটল শৌর্য।

আরশি জিজ্ঞেস করে, "কাকে ফোন করলে?"

"আর-একজন ডিরেক্টর। ইন্ডাস্ট্রির অনেক খবরাখবর রাখে। বলছে এই ধরনের খবর মেকআপ আর্টিস্টরাই সবচেয়ে ভাল দিতে পারবে। নায়িকাদের কাছাকাছি থাকে তারা। মনের কথা আদানপ্রদান হয়। পুরনো এক মেকআপ আর্টিস্টের কাছে খোঁজ নিতে বলল। নবদা, নবকৃষ্ণ কুণ্ডু। আমি চিনি না। বেহালায় থাকে। আবছা মতো একটা অ্যাড্রেস দিল গৌতমদা। সেখানে গিয়ে একটু খোঁজাখুঁজি করতে হবে। ভদ্রলোক এখন আর মেকআপের কাজ করেন না। বাড়িতে বসা, বয়স হয়েছে। ওঁর কন্ট্যাক্ট নম্বর নেই গৌতমদার কাছে..." কথাগুলো বলতে-বলতে উঠে দাঁড়িয়েছে শৌর্য। দেখাদেখি আরশিও। শৌর্য বলল, "চলো, যাওয়া যাক নবকৃষ্ণদার বাড়ি।"

ঘাট থেকে উঠে রেললাইন ক্রস করার আগে ট্রেন আসার আওয়াজ পেল আরশি। শৌর্য এগিয়ে যাচ্ছে দেখে ধরে নিল ওর হাত। আরশির ঝঞ্জাট সামলাতে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে বেচারা। ট্রেনের আওয়াজ পায়নি। ক্রসিংয়ের কাছে এসে হুইস্‌ল দিতে থাকল ট্রেন। সামনে দিয়ে পাস করে যাচ্ছে। শৌর্য-আরশিকে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কী যে আমোদ হল কিছু চ্যাংড়া ছেলের, নিজেদের কামরা থেকে নানা অঙ্গভঙ্গি, চিৎকার, সিটি দিতে থাকল। এই প্রথম কলকাতাকে বড় কুৎসিত লাগল আরশির।

বেহালার অনেক ভিতরের দিকে নবকৃষ্ণ কুণ্ডুর বাড়ি। বারিকপাড়া। পাড়ার লোক এক ডাকে চেনে। গলির শেষমাথায় প্লাস্টার না হওয়া একতলা জীর্ণ-পুরনো বাড়ি। শৌর্যরা সে বাড়ির সামনের ঘরে বসেছে। শৌর্য কাঠের চেয়ারে, আরশি বিছানায়, নবকৃষ্ণ কুণ্ডুর পাশে। নবকৃষ্ণের হাতে আরশির মোবাইল। মায়ের ফোটো ক্লিনে এনে দিয়েছে আরশি। নবকৃষ্ণদার বয়স আন্দাজ করা কঠিন, সত্তরের বেশিই মনে হচ্ছে শৌর্যর। সেটা দারিদ্রের জন্যও হতে পারে। ঘোলাটে চশমাপরা নবকৃষ্ণদা কপালে অনেক ভাঁজ ফেলে আরশির মায়ের ফোটোটা দেখছেন। মোবাইল ধরা হাতটা কাঁপছে। ক্লিনের আলো নিভে যাচ্ছিল, টোকা মেরে জ্বালালে আরশি। জিজ্ঞেস করে, "কী, চিনতে পারলেন?"

মাথা নাড়ছেন নবকৃষ্ণ। বললেন, "এই ফোনটার মতোই হচ্ছে। মনে পড়তে-পড়তে ফের তলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে। তোমরা তো আবার সিনেমার নামটাও বলতে পারছ না। পরিচালককে জিজ্ঞেস করছ না কেন? সুমিত ছবিটার নামও বলে দেবে, সন্ধানও দিতে পারে এঁর।"

"ইন্ডাস্ট্রির লোকজনকে এখনই কিছু জানাতে চাইছি না।

ব্যাপারটা জানাজানি হলে ভদ্রমহিলা যদি আত্মগোপন করে থাকেন, আরও আড়ালে চলে যাবেন। আপনিও দয়া করে আমাদের খোঁজ নিতে আসাটা কাউকে জানাবেন না," বলল শৌর্য।

নবকৃষ্ণ বললেন, "বুঝলাম। ব্যাপারটার মধ্যে একটা রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি। তা এই মহিলা কে হয় তোমাদের?"

"আমার মা," বলে নবকৃষ্ণর হাত থেকে মোবাইলটা নিল আরশি।

সামান্য হোঁচট খেয়েছেন নবকৃষ্ণ। বললেন, "চশমাটা কি আর চলবে না তা হলে? তোমার মুখের সঙ্গে তো কোনও মিল পাচ্ছি না।"

"পাওয়ার বেড়েছে মনে হচ্ছে, ডাক্তার দেখিয়ে নিন," বলল শৌর্য।

নবকৃষ্ণ বললেন, "ডাক্তার দেখানো হয়েছে। কিন্তু চশমার যা দাম আজকাল, হাজারের নীচে তো কথাই বলছে না। বাড়িতে বসে গিয়েছি, এখন এত টাকা পাই কোথায় বলো তো! ছেলে একার হাতে সংসার টানছে।"

শৌর্য অনুমান করে, ঘুরিয়ে টাকা চাইছেন নবকৃষ্ণ। তখন হয়তো কিছু খোঁজ দেবেন। তাই বলে, "যদি কিছু না মনে করেন, চশমার টাকাটা আমরা দিতেই পারি।"

"দিয়ে যাও তা হলে, তবে যদি কোনও খোঁজ না দিতে পারি, চশমাটা আবার খুলে নিয়ে যেয়ো না যেন!" বলে হাসতে লাগলেন নবকৃষ্ণ, হাসিতে মজার বদলে বিষণ্ণতাই বেশি। পার্স থেকে দু'টো পাঁচশোর নোট বের করে ফেলেছে শৌর্য, নবকৃষ্ণর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে, "আপনি মনে করার চেষ্টা করুন। ইন্ডাস্ট্রিতে খোঁজ খবর নিন গোপনে। আমাদের কথা ভুলেও তুলবেন না। ধরে নিন আপাতত এটাই আপনার কাজ। যার বদলে টাকাও দেব আমরা। এই টাকাটা অ্যাডভান্স।"

নোট দু'টো লুঙ্গির ট্যাঁকে গুঁজে নিয়ে নবকৃষ্ণ বললেন, "নাম তো বললে শোভা সেনগুপ্ত। ছবিটা আবার রিলিজ করেনি। একটা খবর অন্তত বের করো সুমিতের থেকে, কথার প্যাঁচ জেনে নাও ওর প্রথম ছবির কতটা অংশ স্টুডিয়োতে শুট হয়েছে এবং কোনও স্টুডিয়োয়। এই খবরটুকু পেলে কাজের সুবিধে হবে আমার।"

"আপনাদের একটু চা দিই?" ভিতর দরজার পরদা সরিয়ে জানতে চাইলেন এক মহিলা।

শৌর্য কিছু বলার আগেই নবকৃষ্ণ বলে উঠলেন, "দুপুরে আর চা খাইয়ো না বউমা। অন্য যে দিন আসবে, ভাল চা এনে রাখব, তখন দিয়ো।"

মহিলা পরদা আড়ালে চলে গেলেন। শৌর্য নবকৃষ্ণকে বলল, "আপনার ফোন নম্বরটা দিন।"

"ও হ্যাঁ, ভাল মনে করিয়েছ! তোমাদের নম্বরটাও দাও," বলে নিজের নম্বর বলতে থাকলেন নবকৃষ্ণ। আরশি-শৌর্য যে যার ফোনে সেভ করে নিল। শৌর্য ভিজিটিং কার্ড বের করে এগিয়ে দেয় নবকৃষ্ণকে। বলে, "এতে আমার নম্বর আছে। আমাকে ফোন করলেই চলবে।"

শৌর্যর বাড়ানো কার্ড নিয়ে নিল আরশি। বলল, "আমার নাম্বারটাও দিয়ে রাখি। যদি কোনও কারণে তোমাকে না পান।"

"ঠিক বলেছ," বললেন নবকৃষ্ণ।

ব্যাগ থেকে পেন বের করে শৌর্যর কার্ডের পিছনে নিজের নম্বর লিখতে থাকে আরশি।

নবকৃষ্ণ কুত্থুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল দু'জনে। শৌর্য বাইকের স্ট্যান্ড তুলে উঠে বসতে যাবে, আরশি বলল, "টাকা তো আমার কাছেও ছিল, তুমি হঠাৎ বের করে দিলে কেন?"

"তোমার বের করতে সময় লাগত বলে," বলল শৌর্য।

আরশি বলল, "না মশাই, না। তুমি এখন থেকে আমায় নিজের মনে করতে শুরু করেছ। সাইকোলজির তো কিছুই বোঝো না দেখছি!"

"সব বুঝি... টাকাটা মেরে দেওয়ার চেষ্টা করছ, সেটাও বুঝতে পারছি! পরে কিন্তু আমি পাই পয়সা চেয়ে নেব," বলল শৌর্য।

আরশি বলে, "অবশ্যই। পরে কেন, আমি এখনই দিতে পারি।"

"নাঃ, পরেই নেব... বাইকের তেলের দামটাও তো ধরতে হবে! হিসেব করতে হবে ধীরে সুস্থে," বলে মাথায় হেলমেট চাপায় শৌর্য। কপট রাগে শৌর্যকে দু'হাত দিয়ে ঠেলা মারে আরশি। বলে, "বদমাইশ কোথাকার!"

গলি শেষ হয়ে এল, বড় রাস্তায় পড়বে বাইক, শৌর্যর ফোন এল। গলি থেকে বেরিয়ে রাস্তার ধারে বাইক থামাল শৌর্য। মোবাইল বের করে দেখে শুধুই নম্বর। কে করছে ফোন? হেলমেট নামিয়ে ফোন কানে নেয় শৌর্য। 'হ্যালো' বলার পর ও প্রান্ত থেকে মহিলাকণ্ঠ বলে ওঠে, "আমার হেলমেটটা অন্য কেউ পরছে না তো?"

একচান্সে মেয়েটাকে চিনতে পারে শৌর্য। হেসে ফেলে বলে, "হঠাৎ হেলমেটের খোঁজ?"

"কেন বলুন তো? আন্দাজ করতে পারছেন কিছু?"

"আই গেস, চাকরিটা হয়ে গিয়েছে তোমার।"

"আরে, আপনি তো দারুণ ইনটেলিজেন্ট! ভাল মানুষরা সাধারণত এতটা বুদ্ধিমান হয় না।"

"থ্যাঙ্কস ফর দ্য কমপ্লিমেন্ট। এবার থেকে কি কলকাতায় থাকতে হবে?"

"একদিন অফ পাব, সেদিন বাড়ি যাব। আর একটা ইচ্ছেও আছে, কী সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।"

"পারছি। কিন্তু আমার যে কোনও ছুটি নেই!"

"আমি শুনবই না সে কথা। আমাকে নিয়ে বেরতেই হবে। ওই জানিটাতে এখনও আমি আছি। চোখ বুজলেই দেখতে পাই বাড়ি-ঘর, গাছ-পালা, নালা-নদী সজোরে পিছিয়ে যাচ্ছে। রোদ্দুর পর্যন্ত ভয় পাচ্ছে তার নাগালের বাইরে না চলে যাই। আমি পরম নির্ভরতায় হাত রেখেছি রাজকুমারের দু'কাঁধে। আর মাতাল হয়ে যাচ্ছি সেই আশ্চর্য পুরুষের গন্ধে, যাকে আমি জন্মেরও আগে থেকে চেয়েছিলাম।"

"হাসপাতালের চাকরিতে এত কবিত্ব থাকবে?"

"থাকবে। সেদিন যখন ইন্টারভিউ দেওয়ার অপেক্ষায় বসে ছিলাম লাউঞ্জে, কাচের দরজার বাইরে সিঁড়িতে পড়েছিল একফালি রোদ, মনে হচ্ছিল দাঁড়িয়ে রয়েছেন আপনি। আমাকে ভরসা দেওয়ার জন্য। ইন্টারভিউটা যাতে ভাল হয়। সত্যিই হয়েছিল। আজ অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা এল বাড়িতে। বাবা-মা, বাড়ির লোক সবাই আপনার গুণগান করছে, আশীর্বাদ করছে। অচেনা কোনও মানুষ এতটা উপকার করতে পারে, ভাবতেই পারছে না। আমি তো আর বলতে পারছি না, আপনি আমার চেনা। বহু-বহু বছর আগের থেকেই চেনা।"

আবার নার্ভাস লাগতে শুরু করেছে শৌর্যর। মেয়েদের রোম্যান্টিক কথাবার্তার সঙ্গে তাল রাখতে পারে না সে। কথা

খুঁজে পায় না। এই মেয়েটা তো আবার হাইভোল্টেজ রোম্যান্টিক। আবার ও প্রান্ত থেকে ভেসে আসে, "সরি, আপনি কোথায় আছেন, কতটা ফ্রি আছেন, না জেনেই বকে যাচ্ছি। গাড়ি-ঘোড়ার আওয়াজ আসছে। তার মানে আপনি রাস্তায়। এখন ছাড়ছি। পরে আবার জ্বালাব।"

কেটে দিল ফোন। দুটো জিনিস জানা হল না, মেয়েটার আর হাসপাতালের নাম। বলছে বটে হাসপাতালে চাকরি পেয়েছি, এর তো মেন্টাল অ্যাসাইলামে থাকার কথা। পুরো পাগলি!

মোবাইল পকেটে রেখে বাইক স্টার্ট করতে যাবে শৌর্য, গাড়িটা কেমন যেন হালকা লাগে। মুহূর্তে পিছনে ঘাড় ফেরায়, ফাঁকা হয়ে যায় বুক, আরশি নেই। গেল কোথায়? বেশি চিন্তা করতে হল না। সামনে রাস্তার বাঁদিক ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হেলমেট খুলে ফেলেছে মাথা থেকে। শৌর্য জানতে চায়, "কী হল, গাড়ি থেকে নেমে গেলে কেন?"

এগিয়ে আসে আরশি বলে, "ফোনের সব কথাই প্রায় শুনতে পাচ্ছিলাম। কারও ব্যক্তিগত কথা তো শোনা উচিত নয়, তাই দূরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।"

"ভাল করেছ, এবার উঠে এসো," বলল শৌর্য।

আরশি জানতে চাইল, "আচ্ছা, আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?"

"লাঞ্চ সারব কোনও রেস্তরাঁয়। ভীষণ খিদে পেয়েছে। তোমার

পায়নি?"

"ভীষণ নয়, তবে পেয়েছে," বলার পর কী একটু ভেবে নিয়ে আরশি বলে, "আচ্ছা, আমরা তো বাড়ি গিয়েই খেতে পারি। আই মিন তোমাদের বাড়ি। খেয়েদেয়ে টানা রেস্ট নেব। রেজাল্ট তো জানা হয়েই গিয়েছে, প্রোডাকশন অফিসে যাওয়ার দরকার নেই। নবকৃষ্ণবাবু মাকে খোঁজার কাজে নেমে পড়েছেন, সুমিত ঘোষকেও এই মুহূর্তে প্রয়োজন নেই আমার।"

"কথাটা অবশ্য খারাপ বলোনি। তবে বাড়িতে বোধহয় স্যাড মেনু। মা-কে যদি বলতাম দুপুরে খাব, এক দু'টো আইটেম বানিয়ে রাখত। এখন ফ্রিজে যা আছে, সবই কাল সন্ধেবেলায় রান্না। রেঁধে গিয়েছে রান্নার লোক স্বপ্নাদি। ওই একই আইটেম আর রিপিট করতে ইচ্ছে করছে না।"

"ঠিক আছে, তা হলে তাই হোক," বলে বাইকে উঠে বসল আরশি।

আরশিরা এখন যেখানে লাঞ্চ করতে এসেছে, সেটা নাকি পৃথিবীবিখ্যাত। বলেছে শৌর্য। জায়গাটার নাম পার্ক স্যার্কাস। হোটেলের নামটাও আরশির শোনা। নিয়মিত কলকাতায় আসা বন্ধুদের থেকেই শুনেছে। এখানকার বিরিয়ানি লা জবাব! বিরিয়ানির সঙ্গে আরও কী সব অর্ডার দিল শৌর্য। আস্তে করে গান বাজছে, এসিও চালানো আছে ঠান্ডা কম রেখে। শৌর্য বসেছে আরশির মুখোমুখি। অন্যমনস্ক হয়ে কিছু একটা ভাবছে। ওয়েটারের দিয়ে যাওয়া জলের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে মাঝে-মাঝে। আরশির চোখ চলে যাচ্ছে কাচের দেওয়াল ভেদ করে রাস্তায় এবং তার আশপাশে। সেখানকার দৃশ্য এই হোটেলের সঙ্গে মানানসই নয়। বরং বিপরীত। বড় অপরিচ্ছন্ন, ধুলোমলিন এক কলকাতা। ফুটপাথে ঘুরে বেড়াচ্ছে ময়লা পোশাকের দু'চারটে ভবঘুরে মানুষ, ফাটা জামা, খালি পায়ের কয়েকজন কিশোর নিজেদের মধ্যে খেলছে, পাশ দিয়ে বাবু শ্রেণির লোক গেলেই ভিক্ষে চাইছে। দু'জন মহিলাকেও ভিক্ষে করতে দেখা গেল। কোনও চার চাকা থামলেই ছুটে যাচ্ছে। এক মহিলার কোলে বাচ্চা। খানিক আগে বাচ্চা কোলে মা তাকিয়ে ছিল কাচঘেরা এই খাবার জায়গাটার দিকে। আরশির আশঙ্কা হচ্ছে এই দৃশ্য সামনে রেখে সে ঠিক মতো খেতে পারবে কি না। শৌর্যকে বলে, "আমরা সিট পালটাপালটি করি?"

"কেন, কী হল?" অবাক হয়ে জানতে চায় শৌর্য।

চেয়ার ছেড়ে উঠতে-উঠতে আরশি বলে, "রাস্তায় ভবঘুরে-ভিখিরি মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাল-ভাল খাবার খেতে অস্বস্তি হবে আমার।"

"আমার হবে না," বলে শৌর্য নিজের সিট ছেড়ে আরশির জায়গায় গিয়ে বসল। তারপর বলল, "বালিতে মুখ গুঁজে সত্যকে তো এড়ানো যাবে না। নিদারুণ আর্থিক বৈষম্য তো আছেই আমাদের দেশে। এর মধ্যে থাকতে-থাকতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি আমরা। তবে তুমি যাদের দেখে সিট চেঞ্জ করলে, সকলেই ভিখিরি নয়, পাতাখোরও আছে।"

"পাতাখোরটা কী ব্যাপার?" জানতে চায় আরশি। শব্দটা আগেও শুনেছে, মানে বোঝেনি।

"হেরোইনখোর। রাংতা পাতার উপর রেখে খাওয়ার জন্য ওই নামটা হয়েছে, নাকি হেরোইন তৈরিতে আফিম গাছের রোল আছে বলে, ঠিক জানি না। আর ওই বাচ্চাগুলোর বোধ হয় অ্যাডহেসিভের নেশা। দেদার বিকোচ্ছে দোকানে। গন্ধ শুঁকে কিংবা খেয়ে নেশা করে। খরচ কম।"

শৌর্যর বলা শেষ হতেই টেবিলে স্যালাডের প্লেট এনে রাখল ওয়েটার। অ্যাডহেসিভের নেশার ব্যাপারটা প্রথম শুনল আরশি। আপাতত বিশদে জানার ইচ্ছে করছে না। শৌর্যর কাছে অন্য একটা জরুরি বিষয় জানার আছে। স্যালাডের প্লেট থেকে শশার টুকরো তুলে নিয়ে কামড়ায় আরশি। জিজ্ঞেস করে, "আমি যে হেলমেটটা পরছি, সেটা তোমার গার্লফ্রেন্ডের?"

"হ্যাঁ, তুমি কী করে জানলে?" নিরাসক্ত গলায় জিজ্ঞেস করল শৌর্য।

আরশি বলল, "ফোনের ওইটুকু কথা শুনেই নেমে গিয়েছিলাম বাইক থেকে। গার্লফ্রেন্ডের নাম কী, কী করে?"

"শুনে তোমার কী লাভ?"

"কিছুই না, জাস্ট কৌতূহল। বন্ধু হিসেবে জিজ্ঞেস করছি।"

"আমি কি একবারও তোমায় জিজ্ঞেস করেছি, তোমার বয়ফ্রেন্ড আছে কি না?"

"সে তো আমার ব্যাপারে তোমার কোনও ইন্টারেস্ট নেই বলেই জিজ্ঞেস করেনি।"

সতর্ক হয় শৌর্য, কথার প্যাঁচে ফেলার চেষ্টা করছে আরশি। প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে শৌর্য বলে, "ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখলাম, তোমার বাবাকে কিন্তু এবার জানানো উচিত তুমি কোথায় আছ এবং কী কারণে এসেছ কলকাতায়।"

"কে জানাবে? তুমি? তোমার কাছে তো বাবার ফোন নম্বর নেই।"

"তুমি জানাবে। জানানোটা ভীষণ দরকার। অন্যের মুখ থেকে যদি জানতে পারেন, দোষারোপ করবেন আমাকে। আমাদের বাড়িতে হয়তো পুলিশ পাঠাবেন।"

"বাবা জানবে কী করে? আর যদি জেনেও যায়, পরিষ্কার বলে দেব, আমি সাবালিকা, আঠারো পেরিয়ে গিয়েছি। নিজের ইচ্ছেমতো যেখানে খুশি যেতে পারি।"

"তোমার ডায়লগ শুনে পুলিশ মাথা নিচু করে থানায় ফিরে যাবে, ব্যাপারটা এত সহজ নয়। তোমার বাবা আমার নামে মেয়েকে ইলোপ করা ছাড়াও, আরও নানাবিধ চার্জ আনতে পারেন। তখন থানা-কোর্ট ঘুরে মরতে হবে আমাকে। ঝামেলাটা কেন ঘাড়ে নেব আমি? তার উপর মায়ের দিকটাও দেখতে হবে, এই সব ঘটনায় মায়ের মনের অবস্থা কী হবে বলো তো?"

"তা ঠিক," বলে চুপ করে ভাবতে থাকে আরশি।

টেবিলে খাবার নিয়ে এল ওয়েটার। দু'টো প্লেটে সার্ভ করে দিচ্ছে। আরশি শৌর্যকে বলে, "এক দু'টো দিন তোমাদের বাড়িতে থাকতে দাও, বাবাকে যদি ফোন করি, এক সেকেন্ড সময় নষ্ট না করে নিতে চলে আসবে। মাকে আর খোঁজা হবে না আমার।"

ওয়েটার খাবার সার্ভ করে চলে গেল। শৌর্য বলল, "তোমার বাবা কি চান না, মা ফিরে আসুন?"

"কেন চাইবে বলো? মা তো স্বেচ্ছায় সংসার ফেলে চলে গিয়েছে। অভিমান হবে না বাবার? তাও তো বাবা প্রথম দিকে খোঁজখবর করছিল। মা ফোনে হুমকি দিয়ে খুঁজতে বারণ করেছে।"

"দোষ যখন মায়ের, তা হলে তুমি কেন তাঁকে খুঁজছ?" জিজ্ঞেস করে খাওয়া শুরু করল শৌর্য।

আরশি বলে, "মা-মেয়ের সম্পর্কটা তো মান-অভিমানের নয়। একেবারে নাড়ির টান। মাকে আমি ভীষণ মিস করি। মা বেঁচে থাকতে কেন আমি তার সঙ্গ পাব না? মা-ও ইদানীং আমায় মিস করছে। তাই তো ফোন করেছিল।"

দু'জন খাওয়ায় মন দেয়। আরশি খাবার মুখে থাকা অবস্থায় জড়ানো উচ্চারণে বলে, "সত্যি, এত ভাল বিরিয়ানি আমি কখনও খাইনি। যাকে বলে অসাম! ভাগ্যিস সিটটা চেঞ্জ করলাম, রাস্তার দিকে চোখ গেলে এই টেস্টটা বোধ হয় পেতাম না। এখন বালিতে মুখ গুঁজে খেয়ে যাচ্ছি।"

নিজের রসিকতায় নিজেই হাসছে আরশি। শৌর্য যোগ দিল না মজায়। মাথায় সিরিয়াস ভাবনা চলছে। বলে ওঠে, "আমাদের বাড়িতে দু'দিন থাকাটাও রিস্ক হয়ে যাবে মনে হচ্ছে। তবু ধরে নিলাম, থাকলে দুটো দিন। তারপর কী করবে?"

"এর মাঝে ফোন করব পূর্বাকে। ততদিনে নিশ্চয়ই কাকিমা অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠবেন। পূর্বা আমাকে ডেকে নেবে ওদের বাড়িতে। তখন আর বাবাকে নিয়ে চিন্তা থাকবে না। বাবাকে বলব পূর্বার অফিসের ক্রাইসিস কেটে গিয়েছে। যে দিন ফেরার টিকিট আছে আমার, ওই দিনই ফিরব।"

থামতে হল আরশিকে, ফোন এসেছে শৌর্যর। টেবিলে রাখা ফোনের স্ক্রিন দেখে শৌর্য বলল, "সুমিতদার ফোন। এখনই চলে আসতে বলবে। প্রোডিউসরের সঙ্গে মিটিং।"

কলটা ধরল না শৌর্য। বলল, "হ্যাঁ, বলো। কী বলছিলে যেন?"

আরশি শুরু করে, "পূর্বাকে অবশ্য এবার আমায় সত্যিটা বলতে হবে। জানাতে হবে মা-কে খুঁজতে এসেছি। কারণ এখন আমি যেটুকু ঘোরাঘুরি করব, সবটাই মায়ের জন্য। পূর্বা আমাকে সঙ্গ দেবে ওর সময়-সুবিধে মতো। ওকে বলব, এখনই বাবাকে কিছু জানাস না।"

আবার ফোন বাজছে শৌর্যর। ঝুঁকে পড়ে স্ক্রিন দেখে বলল, "এ তো মহা মুশকিল, সুমিতদাই করছে আবার। কীসের এত তাড়া?"

বাঁ হাতে কল রিসিভ করে স্পিকার অন করে শৌর্য। বলে, "কী বলছ?"

অপর প্রান্ত থেকে অধৈর্য গলায় সুমিতদা বলে, "আরে, আসবি কখন? প্রোডিউসর এসে বসে আছে।"

"যেতেই হবে? একটা মিটিংয়ে আছি যে।"

"ঢপ মারিস না। মিটিংয়ের ব্যাকগ্রাউন্ডে বুঝি গান বাজে?"

"প্রোডিউসরের সঙ্গে আমার কী কাজ?

"যাঃ শালা! ভুলে গেলি? মহলিয়ায় পাঠালাম পুরনো বাড়ির ছবি তুলে আনতে, নিয়ে এলি রং করা ঝকঝকে বাড়ির ছবি। প্রোডিউসর চাইছে না ও বাড়িতে শুটিং হোক।"

"বাড়িটাকে আমি রং করাইনি এবং ছবি তোলার আগে বাড়ির কন্ডিশন তোমায় জানিয়েছিলাম।"

"আরে ভাই, সে কথা কি আমি অস্বীকার করছি! কিন্তু মালটাকে এ বাড়িটা কিছুতেই খাওয়াতে পারছি না। শালা গোঁ ধরে বসে আছে। আমি, নিবেদিতা দু'জনেই ফেল করে গিয়েছি। তুই ভাই একবারটি আয়।"

"আমি গেলে সুবিধেটা কী হবে শুনি?"

"তুই বলবি, লোকেশন শুট করতে গিয়ে আরও দু'-একটা পুরনো বাড়ি দেখেছিস। এই গল্পের সঙ্গে সেই বাড়িগুলো দিব্যি মানিয়ে যায়।"

"সেরকম কোনও বাড়ি তো আমি দেখিনি আশপাশে।"

"কতটুকু জায়গা আর ঘুরেছিস? আবার আমি রেইকি করতে যাব। খুঁজে নেব মানানসই বাড়ি। তুই আপাতত মিথ্যেটুকু বলে যা। নয়তো মালটাকে ধরে রাখা যাবে না। হড়কে যাবে।"

"ঠিক আছে, একঘণ্টার মধ্যে যাচ্ছি।"

"অত দেরি করিস না বাবু। আর কত আটভাট বকব মালটার সঙ্গে। এ ব্যাটা আবার দিনের বেলা মদ খায় না। প্লিজ, জলদি আয়।"

ফোন কাটল সুমিতদা। শৌর্য আরশিকে বলে, "শুনলে তো সব।"

"শুনলাম। আমার কথা তো কিছু জিজ্ঞেস করলেন না! আমারও তো যাওয়ার কথা ওঁর অফিসে। উনি ভাল করেই জানেন তোমার সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে। পার্ক স্টেটার হোটেলে ওঁকে বলে তুমিই আমাকে রাতে থাকার ব্যবস্থা করেছ।"

"প্রোডিউসর বেঁকে বসলে, পরিচালক নিজের বাবার নামও এক চান্সে মনে করে উঠতে পারে না। সেখানে তুমি তো কোন ছার!"

"মা-কে খোঁজার স্বার্থে তোমার সঙ্গে আমারও কি যাওয়া

উচিত প্রোডাকশন অফিসে?"

"না, আপাতত যাওয়ার দরকার নেই। তোমার কথা যেমন ভুলে আছে, থাক। তোমাকে দেখলে হঠাৎ যদি প্রথম নায়িকাকে মনে পড়ে যায় এবং তাঁর সম্বন্ধে কিছু কথা গোপন করার থাকে, তখন আর সুমিতদার মুখ থেকে কোনও তথ্যই বের করা যাবে না। তার চেয়ে বরং নবকৃষ্ণদার পরামর্শ মতো আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সুমিতদার থেকে জেনে নেব রিলিজ না হওয়া সিনেমার নাম, কোন স্টুডিয়োতে কতটা অংশ শুট হয়েছিল সিনেমাটার, আরও টুকটাক খবর।"

এবার বাকি খাবার তাড়াতাড়ি খেতে থাকে শৌর্য। ইশারায় ওয়েটারকে বিল আনতে বলে।

বিল এবং হাত ধোয়ার গরম জলের বাটি দিয়ে গেল ওয়েটার। হাত ধুতে-ধুতে শৌর্য বলল, "তোমাকে বাড়িতে রেখে সুমিতদার কাছে যাব।"

আরশির হাত ধোয়া হয়ে গিয়েছে। ব্যাগ থেকে টাকা বের করতে যাচ্ছিল, শৌর্য ততক্ষণ ক্রেডিট কার্ড রেখে দিয়েছে বিলের ফোল্ডারে। আরশি বলে, "তোমার কাছে ধার বাড়ছে আমার। সব অর্থে।"

শৌর্যর চোখ যায় আরশির প্লেটে। বলে, "অনেকটাই তো ফেলে রাখলে। এদিকে বলছিলে অসাম টেস্ট। ডায়েট করছ?"

"আমার খাওয়া চিরকালই কম। জোর করে খাওয়ানোর তো কেউ ছিল না... মায়েরা যেমন করে খাওয়ায়... আমার ডায়েট হল বাই ডিফল্ট।"

● ৭ ●

শৌর্যর ঘুম ভেঙেছে অনেকক্ষণ। বিছানা ছাড়তে মন চাইছে না। কাল বেশ রাত করে বাড়ি ফিরেছে। সুমিতদার অফিসেই দেরি হয়ে গেল। প্রোডিউসরকে যেমন-তেমন করে বোঝানো গিয়েছে। এক সপ্তাহ সময় চাওয়া হয়েছে অন্য বাড়ির ছবি দেখানোর জন্য। প্রোডিউসর ফিরে যাওয়ার পর সুমিতদা শৌর্য-নিবেদিতাকে নিয়ে মিটিংয়ে বসল। বলল, "প্ল্যান দে কী করে ওই লোকেশনে পুরনো বাড়ি পাওয়া যায়। আমি আগের বার অনেকটা এলাকা ঘুরে দেখেছি, ওরকম বাড়ি আর একটাও নেই।"

"লোকেশন পালটাও, রাঁচি-হাজারিবাগের দিকে খোঁজ করে দেখা যেতে পারে," বলেছিল নিবেদিতা।

আলমারি খুলে স্কচের বোতল বের করেছিল সুমিতদা। লকারে থাকে বোতল, চাবি সুমিতদার কাছে। তিনজনের জন্য গ্লাসে ঢেলে এক সিপ মেরে বলেছিল, "রাঁচি-হাজারিবাগে গিয়ে হয়তো বাড়ি পাব, তখন যদি প্রোডিউসরের লোকেশন পছন্দ না হয়। এর মাঝামাঝি একটা রাস্তা বার করতে হবে।"

প্যাকেট ছিঁড়ে চানাচুর, চিপস ঢেলে নিবেদিতা বলেছিল, "উপায় আছে, দু'জায়গায় শুট করতে হবে। বাড়ির জন্য হাজারিবাগ, চানার মহুলিয়ার। তাতে খরচাও বাড়বে। দেখো, তোমার প্রোডিউসর তাতে রাজি হয় কি না।"

সুমিতদা বলেছিল, "হবে না। বাজেট ফিক্সড হয়ে গিয়েছে। যা করার ওই টাকার মধ্যেই করতে হবে। উনিশবিশ হতে পারে। বড় অ্যামাউন্ট কিছুতেই দেবে না।"

শৌর্য বলেছিল, "তোমরা তো ধরেই নিচ্ছ হাজারিবাগে প্রোডিউসরের পছন্দমতো এবং সিনেমাটার উপযোগী বাড়ি পাবে। আগে দেখো, পাও কি না। তারপর তো বাজেটের কথা।"

গ্লাস শেষ করে উঠে পড়েছিল নিবেদিতা। দু'পেগের বেশি খায় না। বলেছিল, "আমি চলি। বেশি রাত করলে ঘরে ঢুকতে দেবে না মালকিন। আর এই প্রবলেম আজকের মধ্যে সলভড হওয়ারও নয়।"

অফিস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে থমকে দাঁড়িয়েছিল নিবেদিতা। শৌর্যকে বলেছিল, "জলপাইগুড়ির মেয়েটা রেজাল্ট জানতে এল না। কেন বলো তো? সিনেমায় চান্স পাওয়ার জন্য পাবলিক হেদিয়ে মরে। এই মেয়েটার কী হল?"

"আমি কী করে জানব!" আশ্চর্য হওয়ার ভান করেছিল শৌর্য। একই সঙ্গে প্রমাদ গুনেছিল, আরশির কথা এতক্ষণ মাথায় ছিল না সুমিতদার। প্রসঙ্গটা এসে পড়ায় যদি মনে পড়ে। তার সঙ্গে হয়তো মনে পড়ে গেল নিজের প্রথম সিনেমার নায়িকার কথা। তখন আরশির অডিশন দিতে আসার ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়বে। উধাও হয়ে যাওয়া সেই নায়িকার ব্যাপারে মুখ খুলবে না। সেরকম কিছু ঘটেনি অবশ্য। সুমিতদা নিবেদিতাকে বলেছিল, "শৌর্যই মেয়েটাকে বলে দিয়েছে, সিলেক্ট হয়নি। মেয়েটাকে হোটেলে রাখতে গিয়েছিল শৌর্য। সিলেক্টেড হয়নি জানার পর কেন সে আর এখানে আসবে! বাড়ি ফিরে গিয়েছে।"

কথা বাড়াতে না চেয়ে চুপ করেছিল শৌর্য। নিবেদিতা বলতে লাগল, "মেয়েটাকে আমার বেশ পছন্দ হয়েছিল। টিভি সিরিয়ালে কাস্টিং করতাম। কন্ট্যাক্ট নম্বর অবশ্য আছে। কথা বলে দেখি।"

নিবেদিতা চলে যাওয়ার পর সুমিতদা বলতে শুরু করল, "হ্যাঁ রে, এই প্রোডিউসরটাও পালাবে তা হলে! কিছুই কি করা যায় না? কবে থেকে কাজ না করে বসে আছি বল তো! আবার কি সেই ম্যান্তামারা টিভি সিরিয়ালে ডিরেকশন দিতে হবে?"

নেশা হয়ে গিয়েছিল সুমিতদার। ততক্ষণে হয়তো পাঁচ-ছ' পেগ চাপিয়ে ফেলেছে। শৌর্য দুইয়েতেই আটকে। মদ তার প্রিয় জিনিস নয়। কাউকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য খায় অল্প। সুমিতদার নেশা হয়ে যাওয়াটাকে সুযোগ হিসেবে নিয়েছিল শৌর্য। বলেছিল, "এত ভেঙে পড়ছ কেন? জীবনের প্রথম সিনেমাটার কথা ভাবো। নিশ্চয়ই অনেক বাধাবিপত্তির মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলে। সেই সব দিনের কথা ভেবে সাহস আনো মনে।"

"আর বলিস না! সে যা দিন গিয়েছিল, ভাবতে পারবি না তোরা," বলে গ্লাস শেষ করে নতুন করে ভরে নিয়ে জীবনে প্রথম সিনেমা বানানোর গল্প বলে গিয়েছিল সুমিতদা। ফাঁকে-ফাঁকে প্রশ্ন করে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো জেনে নিচ্ছিল শৌর্য। আরশির মায়ের ব্যাপারে কেন কিছু কথা জানা গেল। ছবির নাম, কোন স্টুডিয়োয় কতটা অংশ শুট হয়েছিল, সবটাই জেনে নিয়েছে শৌর্য। প্রথম সিনেমার নায়িকার কথা বলতে গিয়ে একবারও আরশির কথা মনে আসেনি সুমিতদার। তা হলে কেন ওকে চেনা মনে হয়েছিল, সেটা এখনও স্পষ্ট হচ্ছে না।

শৌর্য বাড়ি ফিরল রাত বারোটা নাগাদ। মা-কে বলাই আছে, দশটার বেশি ওর জন্য অপেক্ষা যেন না করে। খেয়ে নিয়ে শুতে চলে যাবে। চিতা তো ওর কাছে একটা আছেই।

মা শুয়ে পড়লেও আরশি জেগেছিল। শৌর্য ইন্টারলক খুলে ভিতরে ঢুকে জুতো ছাড়ছে, ক্যামেরায় ব্যাগ নিতে এগিয়ে এসেছিল আরশি। বলল, "এত দেরি হল?"

ব্যাগটা আরশির হাতে দিয়ে খানিক সৌজন্যের গলায় শৌর্য বলেছিল, "আমাদের লাইনে এরকম দেরি হয়েই থাকে।"

কথার ঢংয়ে বোধ হয় সন্দেহ হয়েছিল আরশির, আরও কাছে এসে শিওর হয়ে নিয়ে বলেছিল, "মদও খাও তুমি! কোনও

নেশাই তো বাকি রাখোনি দেখছি!"

"মদ আর সিগারেটে ছাড়া আর কিছু খাই না, তাও খুব কম... আর আজকের ড্রিংক করাটা সম্পূর্ণ তোমার জন্য! সেই তুমিই কিনা হ্যাটা করছ!" নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে বলেছিল শৌর্য। একই সঙ্গে ঢের পাচ্ছিল সুমিতদার স্কচটা বেশ খানদানি। আলতো করে অ্যাসেস্ট করে নিয়েছে।

আরশি বলেছিল, "কী! আমার জন্য ড্রিংক করতে হল? কেন, কী করেছি আমি?"

ঘরে ঢুকে এসেছিল আরশি, শৌর্য বলেছিল, "প্লিজ় বাইরে যাও। জামা-কাপড় ছাড়ব। খাবার যদি গরম করতে পার তো করো, নয়তো আসছি আমি।"

"তবু ভাল, ড্রিংক করে এসে বাড়িতে খাব বলছ! মাতালরা তো বলে না," খোঁচা মেরে চলে গিয়েছিল আরশি।

ডাইনিংয়ে এসে শৌর্য দেখেছিল আরশি খাবার সাজিয়েছে টেবিলে। দু'জনের খাবার। শৌর্যর অপেক্ষায় ততক্ষণ অবধি খায়নি মেয়েটা। ড্রেস চেঞ্জ করার পর চোখেমুখে জল দিয়েছিল শৌর্য, ঘোর কেটে গিয়ে তখন মোটামুটি ফ্রেশ। ডাইনিংয়ের চেয়ারে বসতে-বসতে বলেছিল, "অনেক খবর এনেছি তোমার মায়ের।"

সুমিতদার থেকে সংগ্রহ করা সমস্ত তথ্য এক-এক করে আরশিকে বলেছিল শৌর্য। তথ্যগুলো জোগাড় করাটাকে সাফল্য হিসেবে ধরাই যায়। কিন্তু সেগুলো যে আনন্দের ছিল না। গভীর বিষাদের। আরশির মুখে ছায়া জমা হয়েছিল রাজ্যের।

আজ সকালে স্বমহিমায় ফিরে গিয়েছে আরশি। মায়ের সঙ্গে খোশমেজাজে গল্প করছে। কথাগুলো ধরতে না পারলেও, বিছানায় শুয়ে দু'জনের গলা কানে আসছে শৌর্যর। ভাল লাগছে বেশ। অন্য দিন এসময় বাড়ি থাকে নিস্তব্ধ। মাঝে-মাঝে পাখির ডাক। যা নিস্তব্ধতাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। মা আরশিকে ঠিক কী চোখে দেখছে বোঝা যাচ্ছে না। ভাবী বউমা বলে ধরে নিল নাকি, কে জানে! শৌর্যকে তো এখনও কিছু জিজ্ঞেস করেনি।

বাড়ির ডোরবেল বেজে উঠল পরপর দু'বার। এ সময় কে এল? চেনাজানা কেউ এভাবে বেল বাজায় না। দরজা খোলার শব্দ পাওয়া গেল। তারপর এক পুরুষকণ্ঠ। ধমকের সুরে কী যেন বলছেন। বিছানা থেকে লাফিয়ে নামে শৌর্য।

ড্রয়িংয়ে গিয়ে দেখে, সদর পেরিয়ে দাঁড়িয়ে দুই সুবেশ ভদ্রলোক। একজন মেজাজের সঙ্গে মাকে বলছে, "ছেলেকে ডেকে দিন এক্ষুনি।"

ভদ্রলোকের পরিচয় আন্দাজ করতে পারছে শৌর্য। এর মেয়ে এখনও সিনে নেই কেন? ভয়ে লুকিয়ে পড়ল নাকি? এগিয়ে গিয়ে শৌর্য বলে, "কী ব্যাপার, এভাবে কথা বলছেন কেন?"

শৌর্যর হাইট ছয়ের কাছাকাছি। পেটানো চেহারা। বারমুডা টি-শার্ট পরে থাকায় শরীর এখন অনেকটাই অনাবৃত। একটু বুঝি ধস খেলেন ভদ্রলোক। বললেন, "তুমি, মানে আপনি শৌর্য চৌধুরী?"

"হ্যাঁ, আপনি?"

ঘরে ঢুকল আরশি। বলে উঠল, "বাবা তুমি! কাকুও এসেছেন! চিনলে কী করে এ বাড়ি? কাকুরও তো বাড়িটা চেনার কথা নয়।"

"তা হলে ভেবে দ্যাখ, কী অবস্থা গিয়েছে আমাদের! ওঁর স্ত্রী হাসপাতালে। উনি আমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছেন তোকে খুঁজতে।"

"ভেরি সরি কাকু। কাকিমা এখন কেমন?"

"আগের থেকে অনেক ভাল, কাল-পরশু রিলিজ় করে দেবে মনে হচ্ছে," আরশির বাবার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি উত্তর দিলেন। পরিচয় আন্দাজ করতে পারে শৌর্য, আরশির বান্ধবী পূর্বার বাবা। ফের আরশি বলে, "বাবা, তুমি এদেরকে উলটোপালটা কিছু বলোনি তো? পিছনের বাগানে ছিলাম আমি, আসতে দেরি হয়ে গেল।"

"উনি চোটপাট শুরু করেছিলেন। একটু দেরি করে এন্ট্রি নিলে তুমি।আমি তো ভাবলাম পাঁচিল ডিঙিয়ে পালিয়েছ।"

শৌর্যর কথায় কর্ণপাত করল না আরশি। বলল, "বাবা, আমি কিন্তু স্বেচ্ছায় এঁদের বাড়িতে উঠেছি। বা বলা ভাল এঁরা আশ্রয় দিয়েছেন আমাকে।"

"ও সব শেখানো বুলি আমায় শুনিয়ো না। ব্যাগ নাও, বেরিয়ে এসো। কেন এখানে উঠতে হল, সেটা পরে আমি জেনে নেব।"

"প্রথমবার এলেন, এসেই চলে যাবেন? একটু চা অন্তত খেয়ে যান," বললেন অপর্ণা। শৌর্য মায়ের সৌজন্য দেখে অবাক হয়। থতমত খেয়ে গিয়েছেন দুই ভদ্রলোক। ফের অপর্ণা বলে ওঠেন, "আপনারা যে পুলিশ নিয়ে আসেননি, এ জন্য আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। আপনার মেয়েকে কেন আমার বাড়িতে উঠতে হল, সেটা খুব পরিষ্কার করে জানা নেই আমার। আপনাকে এভাবে আসতে দেখে, কৌতূহল আরও বাড়ল। প্লিজ়, আপনারা বসুন। চা খেতে-খেতে সব কথা শুনব।"

কলেজ পড়ায় মা, পার্সোনালিটি অন্যমাত্রার! দুই ভদ্রলোক বসলেন সোফায়। শৌর্য ভদ্রস্থ জামাকাপড় পরতে গেল।

বাথরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে শৌর্য ফিরল একটু দেরিতে। ড্রইংয়ে তখন তর্ক-বিতর্ক তুঙ্গে। বাবার উপর চোটপাট করছে আরশি। শৌর্যকে দেখে সোফা ছাড়ল মা। বলল, "তুই বোস। আমি তোর চা নিয়ে আসছি।"

শৌর্য বসল মায়ের জায়গায়। আরশি বসেনি। বাবার মুখোমুখি দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বলছে, "তুমি আমাকে জানাওনি মা সিনেমায় 'রায়া সেন' নাম নিয়েছিল। সিনেমাটার নামও চেপে গিয়েছ। আরও হয়তো অনেক কিছুই গোপন করেছ যাতে মায়ের কাছে পৌঁছতে না পারি। কেন বলোনি এসব কথা? আমার কি জানার অধিকার নেই?"

"আছে, কিন্তু সেসব শুনে কি মায়ের জন্য গর্ব হত তোর? মন খারাপ হত! সত্যিই তোকে আমি অনেক কিছু বলিনি... চেয়েছি শোভার ওই সব কীর্তি থেকে তোকে দূরে রাখতে, শিশুমনে প্রভাব পড়তে পারে ভেবে," বললেন আরশির বাবা রজত সেনগুপ্ত।

আরশি বলে, "আমার মনে হয় না এটাই একমাত্র কারণ। আরও অনেক ব্যাপার আছে।"

"সেগুলো কী?" জানতে চাইলেন আরশির বাবা।

পূর্বার বাবা একটু উসখুস করছিলেন, অস্বস্তি হচ্ছিল পারিবারিক গোপন কথাবার্তার সামনে বসে থাকতে। আরশির বাবার উদ্দেশে বললেন, "রজতবাবু, আমি উঠি। হাসপাতালের খোঁজখবরগুলো নিই। বাড়িতে কেউ না-কেউ থাকবেই, আরশিকে নিয়ে চলে আসবেন।"

"ঠিক আছে, তাই হবে... আপনাকে অনেক ট্রাবল দিচ্ছি!" বললেন রজতবাবু।

"না না, ট্রাবলের কী আছে! আমি তো আপনার পরিবারের লোক," বলে সোফা ছেড়ে উঠলেন পূর্বার বাবা। মা চা নিয়ে এল।

শৌর্য মায়ের হাত থেকে চায়ের মগ নেয়। মা পূর্বার বাবাকে বলে, "চলে যাচ্ছেন? আবার আসবেন কিন্তু।"

"আসব, দেখা হবে..." বলে জোড়হাত করে নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন পূর্বার বাবা।

মা বড় সোফাটায় বসল। দু'হাত তফাতে আরশির বাবা। আরশি এতটাই উত্তেজিত, পূর্বার বাবার ছেড়ে যাওয়া সোফাতে বসছে না। দাঁড়িয়েই রইল। বাবার উদ্দেশে বলে ওঠে, "মায়ের খোঁজে তুমি কোনওদিনই সুমিত ঘোষের কাছে যাওনি। সুমিত ঘোষ নিজে বলেছেন শৌর্যকে।"

"উনি মিথ্যে বলছেন। আমি গিয়েছিলাম এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে। আমাদের সঙ্গে ভাল করে কথাই বলেননি সুমিতবাবু।"

"তোমার সেই বন্ধু এখন কোথায়?"

"কেন? তুমি কি তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করবে আমরা সুমিত ঘোষের কাছে গিয়েছিলাম কিনা? বাবার উপর হঠাৎ এত অবিশ্বাসের কারণ?"

"তুমি যদি বলতে তোমার সেই বন্ধু মারা গিয়েছে, মিটে যেত। কারণটা যখন জানতেই চাইছ, বলি। মা একটা সিনেমায় চান্স পাওয়ার পর আর পাচ্ছিল না। পরিচালকদের দোরে-দোরে ঘুরেছে। ফ্রাস্ট্রেশনে মদ খাওয়া ধরেছিল মা। তোমার কানে সেটা গিয়েছে, তাই আর সেভাবে মায়ের খোঁজ করোনি। পাছে নষ্ট বউকে ঘরে তুলতে হয়।"

মাথা নিচু করে নিয়েছেন আরশির বাবা। মেয়ে এখন যে খবরগুলো দিচ্ছে, তার অনেকটাই সত্যি। সুমিতদার থেকে সব শুনে আরশিকে কাল রাতে বলেছিল শৌর্য। সুমিতদা বলেছে, "শোভা সেনগুপ্তর হাজব্যান্ড তার কাছে কোনও দিনই আসেনি। বরং শোভাদেবী সুমিতদার কাছে এসে বলতেন, 'বর আর ঘরে নেবে না বলেছে। আমাকে ছোটখাটো যে কোনও পার্ট দিন।'"

রজতবাবু সত্যিই কি সংসারে ফেরাতে চাননি স্ত্রীকে, নাকি শোভাদেবী কথাগুলো বলতেন করুণা আদায়ের জন্য, সে ব্যাপারে তো নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। এই সংশয়ের কথা আরশিকে বলেছিল শৌর্য, সে কানে নেয়নি। মায়ের পক্ষ নিয়ে বসে আছে। মেয়ের চোটপাটে বিধ্বস্ত অবস্থা রজতবাবুর। এতটা অপমান বোধ হয় ওঁর প্রাপ্য নয়।

শৌর্য বলে ওঠে, "সুমিতদার সব কথা ধ্রুবসত্য বলে ধরে নেওয়াটা ঠিক হচ্ছে না। হয়তো রজতবাবুরা গিয়েছিলেন সুমিতদার কাছে। কোনও কাজ ব্যস্ত ছিল সুমিতদা। তাই বেশি কথাবার্তার সুযোগ হয়নি। মাঝে দীর্ঘ ষোলো বছর কেটে গিয়েছে, রজতবাবুর সঙ্গে দেখা হওয়াটা ভুলে গিয়েছে সুমিতদা।"

অপর্ণা বলে উঠলেন, "আমি একটা কথা বুঝে উঠতে পারছি না, যে সময়টা চলে গিয়েছে, তাকে নিয়ে এত কাটাছেঁড়া হচ্ছে কেন? অতীত সব সময়ই মৃত। বর্তমানে কী করা উচিত তা নিয়েই ভাবা দরকার।"

"আমার মা তো মৃত নয়! ফোন করেছিল আমাকে! এখন কোথায় আছে, কে জানে!" বলল আরশি।

অপর্ণা বলেন, "সোফাটায় বোসো আরশি। মাথা ঠান্ডা রেখে ভাবো এখন কী করা উচিত। ভাবার ক্ষমতাটাও তোমার বাবার তৈরি করে দেওয়া। তিনি তোমার প্রতি কোনও অবহেলা করেননি।"

আরশি বসল পূর্বার বাবার ছেড়ে যাওয়া সোফাটায়। খানিকটা সমর্থন পেয়ে মাথা তুলেছেন রজতবাবু। ফের অপর্ণা বলেন, "অতীতকে আমরা নিজের পছন্দমতো নির্মাণ করি। প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে যার অনেকটাই ফারাক থেকে যায়। ফোনটা যে শোভাদেবীই করেছিলেন, সে ব্যাপারে এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ফোনের কথা যদি আমি ছেড়েও দিই, শোভাদেবী এখন কোথায় আছেন, কী অবস্থায় আছেন, আদৌ আছেন কিনা, এগুলো জানার ইচ্ছে আরশির হতেই পারে। আফটার অল শোভাদেবী ওর মা। মায়ের প্রভাব থেকে বাঁচাতে গিয়ে রজতবাবু মায়ের অভাব তৈরি করে ফেলেছেন আরশির মনে। যে কারণে ও এত ঝুঁকি নিয়ে মাকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছে।"

ঘরের চারজনই এখন চুপ। শৌর্য অবাক হয় দেখে, মা কী সুন্দর ভাবে পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলল। আরশিদের ব্যাপারে অনেক কিছুই জেনে গিয়েছে মা, যেমন আরশির মায়ের ফোন আসাটা। শৌর্য যখন ড্রেস চেঞ্জ করতে গিয়েছিল, তখনই হয়তো এসব কথা উঠেছে। রজতবাবু কী করে শৌর্যদের বাড়িতে পৌঁছলেন সেটাও।

কথা শুরু করলেন রজতবাবু, "হ্যাঁ। এটা হয়তো ঠিক, আমি আমার প্রতি উপেক্ষা, অপমানকে গুরুত্ব দিয়েছি বেশি। শোভাকে যতটা উদ্যোগ নিয়ে খোঁজা উচিত ছিল, খুঁজিনি। এবার শোভার ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। সে যদি বেঁচে নাও থাকে, সেটা জানাও জরুরি। বেঁচে থাকলে কোথায়, কী অবস্থায় আছে, দেখাটা আমার কর্তব্য। আমি বিভিন্নভাবে খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা চালাব। আপাতত আরশি বাড়ি চলুক।"

আরশি বলল, "না, এখনই জলপাইগুড়ি ফিরব না আমি। এই ক'দিনে মায়ের ব্যাপারে অনেকটাই জেনতে পেরেছি। লোক লাগিয়েছি মাকে খুঁজতে। এখন তো কলেজ নেই। মাকে খোঁজার কাজটা চালিয়ে যাব।"

"ঠিক আছে, তাই হবে। আপাতত পূর্বাদের বাড়িতে চল। এঁদের এভাবে বিরক্ত করার তো কোনও মানে হয় না। এঁরা ভাল মানুষ বলেই তোর মতো অচেনা একজনকে আশ্রয় দিয়েছেন।"

বাবার কথা পছন্দ হয়নি আরশির। বলল, "পূর্বাদের বাড়ি যাব না এখন। আমি আর শৌর্য মিলে মায়ের খোঁজ নিচ্ছি, এ বাড়িতে থেকেই কাজ করতে সুবিধে হবে আমাদের।"

"তা হয় না আরশি, সেটা ভাল দেখায় না।" বললেন রজত।

আরশি বলে, "মন্দ দেখানোর কী আছে! তুমি জিজ্ঞেস করো মাসিমাকে, আমি বিরক্ত করি কি না," কথা শেষ করে অপর্ণার দিকে তাকায় আরশি। জিজ্ঞেস করে, "কী মাসিমা, আমি এ বাড়িতে থাকলে সমস্যা হবে আপনার?"

"তা হবে না, তবু সমাজ বা আত্মীয়স্বজনের কথাও তো খেয়াল রাখতে হবে!" বললেন অপর্ণা।

আরশি বলে, "এখানে হঠাৎ সমাজ, রিলেটিভদের কথা চলে এল কেন? আমি কোথায় থাকব, তা নিয়ে তাদের কী যায় আসে!"

শৌর্য বলল, "তাদের নয়, তোমার ভবিষ্যৎ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সদ্য পরিচিত অনাত্মীয়ের বাড়িতে, যে বাড়ির ছেলে অবিবাহিত, সেখানে বেশিদিন কাটালে অনেক প্রশ্ন উঠবে। প্রশ্নগুলো একের পর-এক বিয়ের সম্বন্ধ ভাঙবে তোমার।"

আরশি বলল, "সম্বন্ধ করে বিয়ে করবই না আমি। ভীষণ বোকা-বোকা ব্যাপার।"

"আমার সে সব ছুঁৎমার্গ নেই, সম্বন্ধ করে বিয়ে করতে আমি রাজি, তোমাকে এবাড়িতে থাকতে দিয়ে বিয়ের বাজারে নিজের নাম খারাপ করতে চাই না..." কপট গাম্ভীর্যে বলল শৌর্য।

আরশি অপর্ণাকে বলে, "দেখছেন মাসিমা, কীরকম ইয়ার্কি মারছে।"

"না, আমি সিরিয়াস। পুরুষ বলে কি চরিত্রের কোনও দাম নেই? কেন দাগ লাগতে দেব সেখানে?"

শৌর্যর কথায় অপর্ণা, রজত দু'জনেই হাসছেন। আরশির মুখ ভার। অপর্ণা তাকে বোঝান, "পূর্বারা দুঃখ পাবে তুমি যদি ওঁদের বাড়িতে না থাকো। ওঁরা তো তোমার অনেকদিনের চেনা।"

"যেতেই হবে? যাই তা হলে..." বলে ব্যাজার মুখে সোফা ছাড়ল আরশি। ভিতর ঘরের দিকে গেল লাগেজ আনতে। বরাবরের জন্য ঘাড় থেকে নেমে গেল কি? গেলে ভাল হয় না খারাপ, বুঝে উঠতে পারে না শৌর্য। একটু যেন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে মনটা।

● ৮ ●

পূর্বাদের বাড়িতে দু'টো দিন কেটে গেল আরশির। জায়গাটা সল্ট লেক। বাবা জলপাইগুড়িতে ফিরে গিয়েছে পরের দিনই। যে বদনামের ভয়ে আরশিকে আনা হল পূর্বাদের বাড়ি, তা রোখা যায়নি। কাকিমা ধরেই নিয়েছেন শৌর্যর সঙ্গে তার স্পেশ্যাল রিলেশনশিপ আছে। গতকাল এ বাড়িতে এসেছিল শৌর্য। সুমিত ঘোষ আরশিকে ডেকে পাঠিয়েছেন। এতদিনে তিনি আবিষ্কার করেছেন আরশিকে চেনা মনে হওয়ার কারণ। শৌর্যকে বলেছেন, "ভেবেছিলি নেশার ঘোরে আমি বুঝতে পারব না কেন খোঁজ নিচ্ছিস আমার প্রথম ছবির। ঠিক সেই মুহূর্তে তোর উদ্দেশ্যটা ধরতে না পারলেও, তুই চলে যাওয়ার পরই মানসচোখে ভেসে উঠল শোভার চেহারাটা। ওর হাঁটাচলা, কথা বলা... ওকে যে হাতে করে তৈরি করেছি, নাম দিয়েছি নতুন, তুই-ই ওর স্মৃতিটা উসকে দিয়ে গেলি। তাই আর বেশিক্ষণ সময় লাগেনি জলপাইগুড়ির মেয়েটার সঙ্গে মিলে খুঁজে পেতে। মা-মেয়ের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, কথা বলার ধরনে ভীষণ মিল।" বলার পর সুমিত ঘোষ শৌর্যর কাছে জানতে চান, মেয়েটা কি এখন জলপাইগুড়িতে? শৌর্য 'এখানেই আছে' বলাতে সুমিত ঘোষ বলেছেন, 'একবার নিয়ে আসতে পারবি? আগের দিন ভাল করে আলাপই হল না।' সুমিত ঘোষের ইচ্ছেটা শৌর্য ফোন করে জানিয়েছিল আরশিকে। আরশি বলেছিল, 'চিনে যখন ফেলেছেন, দেখাটা সেরেই আসি। হয়তো মায়ের ব্যাপারে আরও কিছু জানা যাবে। যেগুলো আমাকে বলার উপযুক্ত, তোমাকে নয়। তাই বলেননি।'

জানা গেল নতুন কিছু তথ্য। যার একটা হয়তো শৌর্যকেও বলেছিলেন, আরশির কাছে কথাটা চেপে গিয়েছে সে। বলতে বেধেছে শৌর্যর। সুমিত ঘোষের কথা অনুযায়ী মা দুই প্রযোজকের কাছে বছর দু'-তিনেক করে থেকেছে। তাদের অনুগ্রহেই গোটা তিনেক ছবিতে অভিনয় করেছে ছোট রোলে। মা রক্ষিতা ছিল, এ কথাটা সম্ভবত আরশির কাছে বলে উঠতে পারেনি শৌর্য। সুমিত ঘোষ আরও বলেছেন, মা অনেকদিন পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিল। গুরুর মতো সম্মান করত। অভিনয়ের খুঁটিনাটি শিখেছিল সুমিত ঘোষের থেকে। শুধুমাত্র পার্ট চাইতে আসত না মা, নিজের কষ্টের কথাও শেয়ার করত। সুমিত ঘোষ বহুবার বলেছিলেন, তুমি বাড়ি ফিরে যাও। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি বড় কঠিন ঠাঁই। একা লড়া যায় না। মা শোনেনি। বলত, 'আর ফেরার মুখ নেই আমার। শ্বশুরবাড়ি, বাপের বাড়ি কোথাও না।'

মা বেশ কয়েকবার মদের টাকাও নিয়েছে সুমিত ঘোষের কাছ থেকে। এত কথা বললেন সুমিত ঘোষ, বাবার দেখা করতে আসার ঘটনাটা বললেন না! আরশি একবার জিজ্ঞেস করল, বললেন, "না, না, শোভার স্বামীর পরিচয় দিয়ে কেউ কখনও আমার কাছে আসেনি।"

বাবা কি তা হলে অন্য পরিচয়ে এসেছিল, না কি আসেইনি? তবে মাকে স্ত্রী হিসেবে মেনে নেওয়া বাবার কাছে ন্যায্য কারণেই অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। ক্রমশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল মা। একজন স্বামী কেন সেটা মেনে নেবে? নষ্ট হলেও মা আরশির কাছে মা হয়েই থাকবে। সম্পর্কটা পালটাবে না। নিজের শিশু সন্তানকে যখন কোনও মা ফেলে দিয়ে যায়, লোকে তাকে নিষ্ঠুর বলে। তেমনি কোনও সন্তান যদি 'নষ্ট' আখ্যা দিয়ে কোনও মাকে এড়িয়ে যায়, সেটা কি নিষ্ঠুরতা নয়? মায়ের কাছে পৌঁছবেই আরশি। বলবে, 'বাবার কাছে হলেও, তুমি তো আমায় ফেলেই গিয়েছিল। কেন? কোন অনিবার্য কারণে? নাকি শুধুই নাম-যশের লোভ?'

গল্পগাছার মাঝেই সুমিত ঘোষ অফার দিয়েছেন, 'দখিন হাওয়া' সিনেমাটার একটা ছোট রোলের। যে রোলটার জন্য অডিশন দিয়েছিল আরশি, তার বন্ধুর চরিত্রে। সুমিত ঘোষ বলেছেন, "তোমার মা আমার ছবিতে অভিনয় শুরু করেছিল, তুমিও করবে। দুই প্রজন্মকে ডিরেকশন দেওয়াটা আমার কাছে বেশ একটা গর্বের হবে। এবং কথা দিচ্ছি, এ ছবি রিলিজ করবেই। এখন তো আমি আর নতুন নই ইন্ডাস্ট্রিতে।"

"এমন হবে না তো মা-মেয়ের কমন জিনের জন্য তোমার এ ছবিও আটকে গেল!" ফাঁক বুঝে ফুট কেটেছিল শৌর্য। সুমিত ঘোষ বলেছিলেন, "তুই তো জানিস, আমার মধ্যে ওসব ফালতু সংস্কার নেই।"

নিবেদিতাদি আর এক প্রস্তাব যোগ করল। সিরিয়ালে লিড রোলে অভিনয় করাবে আরশিকে। সেটার লুকটেস্ট হবে দিন পনেরো বাদে। নিবেদিতাদির স্থির বিশ্বাস, লুকটেস্টে সিলেক্ট হবেই আরশি...

বাইকে করে শৌর্য যখন আরশিকে দিতে আসছিল পূর্বাদের বাড়ি। বলেছিল, "তোমার তো কপাল খুলে গেল দেখছি! আর ক'দিন পরেই একেবারে সেলেব্রিটি!"

আরশি তখন বলে, "সেলেব্রিটির নিকুচি করেছে। মাকে খুঁজে পেলেই সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরব। এরা যদি আমাকে সিনেমা-সিরিয়ালের অফার না দিয়ে মাকে এনে দিত, উপকার হত বেশি।"

পূর্বাদের বাড়ির সামনে নামিয়ে কাজ যখন চলে যাচ্ছে শৌর্য, আরশি বলেছিল, "এদের সঙ্গে একটু কথা বলে যাও না। তোমার ব্যাপারে শুনেছে, আলাপ করতে আগ্রহী। আজ যখন নিতে এসেছিলে, সুযোগই পেলাম না তোমার সঙ্গে দেখা করাবার।"

আরশির অনুরোধ রেখেছিল শৌর্য। মিনিট কুড়ি ছিল পূর্বাদের বাড়ি। চা-টা খেল। কাকিমা এখনও বেডরিড়ন, শৌর্য বিছানার কাছে গিয়ে আলাপ সেরে এল। ও চলে যেতেই পূর্বা বলেছিল, "এ যদি তোর বয়ফ্রেন্ড না হত, আমি জান লড়িয়ে দিতাম ওকে পেতে। কী হ্যান্ডসাম মাইরি!"

কাকিমা আবার বিষণ্ণ ভাবে বললেন, "আমার মেয়েটার যে কী হবে! তুই তো নিজের জন্য একটা হিল্লে করে নিলি। কী ভাল ছেলে! যেমন দেখতে, তেমন ব্যবহার!"

এ বাড়িতে এসে লাভটা তা হলে কী হল? আরশির সঙ্গে সেই তো জড়িয়ে গেল শৌর্যর নাম। যা নিয়ে ভয় পাচ্ছিল বাবা, শৌর্যর মা।

"কী রে, এখনও এল না?"

পূর্বার ডাকে সংবিৎ ফিরল আরশির। মুখের সামনে থেকে খবরের কাগজ সরিয়ে রিস্টওয়াচ দেখল। বলল, "সেই তো দ্যাখ

না, বলল ন'টায় আসছি। এখনও পাত্তা নেই।''

''আমি বেরলাম। একটু দেরিই করলাম তোর বয়ফ্রেন্ডকে একবারটি দেখার জন্য। এর বেশি দেরি করলে চাকরি যাবে আমার। চলি।''

হাত নেড়ে অফিস বেরিয়ে গেল পূর্বা। শৌর্যর দেরি হচ্ছে কেন বোঝা যাচ্ছে না। মেকআপ আর্টিস্ট নবকৃষ্ণ কুণ্ডু দেখা করতে বলেছেন আজ। দশটা নাগাদ, টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশনের সামনে থাকবেন। খবর দেবেন কিছু। সুমিত ঘোষ যে তথ্যগুলো দিয়েছেন, ফোনে নবকৃষ্ণবাবুকে সবই জানানো হয়েছে। উনি নতুন খবর সংযোজন করবেন। বেরনোর জন্য আরশি যখন ড্রেস করছিল, পূর্বা বলেছিল, ''আসছে মনে হচ্ছে সে! কোথায় যাবি?''

গন্তব্য বলেছিল আরশি। পূর্বা বলল, ''সে তো এখান থেকে অনেক দূর...''

দূরত্ব যদি অনেকটাই, তা হলে এখনও কেন এল না শৌর্য? কোনও কাজে আটকে গেল কি? তাই যদি হয়, এতক্ষণে নিশ্চয়ই একটা ফোন করত। ভেবে আরশি মোবাইল বের করে শৌর্যকে কল করতে যাবে, বাড়ির সামনে বাইকের হর্ন। সোফা থেকে তড়াক করে উঠে পড়ে আরশি। ভিতর বাড়ির উদ্দেশে গলা তুলে বলে, ''কাকিমা বেরচ্ছি। টেনে দিয়ে যাচ্ছি দরজা।''

উত্তরের অপেক্ষা করে না আরশি। এদেরও ইন্টারলক, দরজা টেনে বেরিয়ে যায়।

রাস্তায় কিছু দূর অন্তর সিগনাল। প্রত্যেকটায় দাঁড়াতে হচ্ছে। ঘড়িতে দশটা বেজে দশ। আরশি আন্দাজ করতে পারছে না টালিগঞ্জ আর কতটা দূরে। অপেক্ষায় আছেন নবকৃষ্ণবাবু। কতক্ষণ আর থাকবেন? হয়তো এক্ষুনি ফোন করে জানাবেন, 'আমি চললুম।'

বাইকে ওঠার আগে আরশি শৌর্যকে জিজ্ঞেস করেছিল, ''এত দেরি হল!''

''আর বোলো না! আসার সময় দারুণ একটা সাবজেক্ট পেয়ে গেলাম, ছবি তুলতে গিয়ে লেট হয়ে গেল!'' বাইক চালাতে-চালাতে বলেছিল শৌর্য।

আরশি জানতে চেয়েছিল, ''কী সাবজেক্টটা পেলে?''

''শ্যামবাজার মোড় পার হওয়ার পর দেখি একটা গারমেন্টস শপের বাইরে সার দিয়ে দাঁড় করানো বেশ কিছু জামা-কাপড়হীন ম্যানিকুইন। দোকান পরিষ্কার হচ্ছিল, ম্যানিকুইনগুলোর নীচে বসে সস্তার ড্রেস মেটেরিয়াল বিক্রি করছে এক দোকানি। এই সাবজেক্ট কি ছাড়া যায়? মনে হচ্ছিল, ম্যানিকুইনগুলো বড় দোকানের দাসত্ব অস্বীকার করে নিরাবরণ হয়েছে। রাস্তায় বসা দোকানির হয়ে প্রমোশন করছে ওই অসহায়!'' এক্সসাইটেড গলায় বলেছিল শৌর্য। আরশি বুঝেছিল বিষয়টা বেশ ভারী, মানেটা তার কাছে পুরোপুরি পরিষ্কার হয়নি। এই আলোকচিত্রী নিয়ে এখন বেশ চিন্তায় পড়েছে আরশি। মাকে খোঁজার ব্যাপারে ওকে সব সময় পাওয়া যাবে তো? নাকি তেমন কোনও সাবজেক্ট পেলে ভুলে যাবে সব কিছু?

''এসে পড়লাম, ওই যে দেখা যাচ্ছে দাঁড়িয়ে আছে নবকৃষ্ণদা,'' বলল শৌর্য।

আরশি ভদ্রলোককে দেখতে পাওয়ার আগেই শৌর্যর বাইক পৌঁছে গেল তার সামনে। সিট থেকে নেমে এল আরশি। তাড়াতাড়ি হেলমেটটা খোলে, অনেকক্ষণ ধরে পরে আছে। বাইকে বসেই শৌর্য নবকৃষ্ণবাবুকে বলল, ''কথাগুলো এখানে দাঁড়িয়েই বলবেন, নাকি বসব কোথায়?''

''না, না, বসার দরকার নেই, ছোট খবর, এখনই বলা হয়ে যাবে,'' বললেন নবকৃষ্ণবাবু।

শৌর্য আর বাইক থেকে নামল না। শুধু হেলমেটটা খুলে ফেলল। নবকৃষ্ণবাবুর পরনে পুরনো ঢলঢলে প্যান্টশার্ট, পায়ে ততধিক পুরনো চামড়ার চটি। শার্টের পকেট থেকে একটা চিরকুট বার করে শৌর্যকে দিলেন। বললেন, ''এটা হচ্ছে একটা নেশা ছাড়ানো প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা। এখানে রাখা হয়েছিল রায়া সেনকে।''

কাগজটায় চোখ বুলিয়ে শৌর্য এগিয়ে দেয় আরশির দিকে। ঠিকানাটা পড়ল আরশি। যেহেতু কলকাতার রাস্তাঘাট চেনে না, বুঝল না জায়গাটা কোথায়। নবকৃষ্ণ বলছেন, ''রায়া সেন ওখানে এখন নেই। কোথায় আছে তার খোঁজ চালাচ্ছি। উমেশবাবুকে চেনো?''

শৌর্য দু'পাশে মাথা নাড়ে। অর্থাৎ চেনে না। নবকৃষ্ণ বললেন, ''নাম নিশ্চয়ই শুনেছ। তুমি সিনেমা লাইনের লোক, না শোনার কথা নয়। যাই হোক, উমেশবাবু বিরাট একজন প্রোডিউসর, ডিস্ট্রিবিউটর। নিরুদ্দেশ হওয়ার আগে রায়া সেন ওঁর কাছেই ছিল। উমেশবাবুর বাড়িতে নয়। আলাদা একটা ফ্ল্যাটে। রায়া তখন মদের নেশায় ডুবে গিয়েছে। ঘুম থেকে উঠে রাত অবধি নেশা করে যাচ্ছে। উমেশবাবু ওকে নেশা ছাড়ানোর প্রতিষ্ঠানে রেখে আসেন। সেখানে কিছুদিন ছিল, নেশা আদৌ ছাড়তে পেরেছিল কি না, জানতে পারিনি।''

''ওই সেন্টারে গেলেই তো জানা যাবে?'' বলল শৌর্য।

নবকৃষ্ণ বললেন, ''জানা যাবেই, এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় না, মনে রাখতে হবে রায়া ছিল উমেশবাবুর পাঠানো পেশেন্ট। উমেশবাবুর বিরাট প্রতিপত্তি। সিনেমা ছাড়াও আর অনেক কিছুর ব্যবসা আছে। মন্ত্রীদের সঙ্গে নিয়মিত ওঠা বসা। উনি যদি ওই প্রতিষ্ঠানে বলে রাখেন, 'রায়ার ব্যাপারে কেউ কিছু জানতে এলে মুখ খুলবে না', ওরা সেটা অক্ষরে-অক্ষরে পালন করবে। তোমরা একবার গিয়ে কথা বলে দেখতে পারো। তবে কি না খুবই সাবধানে। রায়ার খোঁজ নেওয়া মানে উমেশবাবুর গোপন জীবনে উঁকি দেওয়া।''

শৌর্য বলে, ''উমেশবাবুর যে ফ্ল্যাটে রায়া সেন থাকতেন, সেটার ঠিকানাটা জেনেছেন? হতে পারে রিহ্যাব সেন্টারে সুস্থ হয়ে

উঠে উনি ওই ফ্ল্যাটেই চলে গিয়েছেন।"

"হতেই পারে। ওই ফ্ল্যাটের খোঁজ চালাচ্ছি। আসলে অনেক বছর হয়ে গেল তো, কিছু খবর পাচ্ছি, কিছু পাচ্ছি না। কেউ তো আর রায়া সেনকে ফলো করে বসে ছিল না। কত অভিনেতা-অভিনেত্রী ইন্ডাস্ট্রিতে আসে-যায়, কে কার খবর রাখে! কার তত সময়! রায়া সেন নেহাত উমেশবাবুর কনুইয়ে হাত গলিয়ে পার্টিতে ঘুরত, তাই এই খবরগুলো পাওয়া গিয়েছে!" বললেন নবকৃষ্ণ। শৌর্য জিজ্ঞেস করে, "খবরগুলো আপনাকে দিচ্ছে কে?"

নবকৃষ্ণ বললেন, "ইন্ডাস্ট্রির লোক। তাই জন্যই তো দু'দিন ধরে স্টুডিয়ো পাড়ায় ঘুরছি। অনেক খরচ হয়ে যাচ্ছে। বিনে পয়সায় তো কেউ খবর দেবে না। চপ-কাটলেট খাওয়াতে হচ্ছে। আগে যা দিয়ে গিয়েছিলে সব টাকা শেষ।"

শৌর্য বলল, "টাকা যে শেষ, আপনার মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পেরেছি। চশমাটা এখনও পালটাননি।"

নবকৃষ্ণবাবুর মুখের দিকে ভাল করে তাকায় আরশি, শৌর্য ঠিকই বলছে। তার কেন প্রথমে চোখে পড়ল না! নবকৃষ্ণ বলছেন, "আর চশমা! তোমরা চলে যাওয়ার পরই বউমা পুরো টাকাটাই কেড়ে নিয়েছিল। বললাম, 'পাঁচশো দাও, নয়তো ওদের কাজটা করব কী করে?' দিল পাঁচশো। তাই খবরগুলো দিতে পারলাম। টাকার দরকার বলেই তোমাদের ডেকে পাঠালাম এখানে। নয়তো সব খবর ফোনেই দেওয়া যেত। বাড়িতে ডাকতে সাহস হল না। ফের যদি ছিনতাই হয়ে যায় টাকা!"

"ছিনতাই কেন বলছেন! ওই টাকাটা তো আপনার বউমা সংসারের জন্যই নিয়েছেন," বলল আরশি। আসলে যাচাই করতে চাইল নবকৃষ্ণবাবুর বউমাটিকে।

নবকৃষ্ণ বললেন, "হ্যাঁ, সংসারেই খরচ করবে। তবে কিনা টাকাকে আকাশ থেকে পড়া বলে ধরে নিলে চলবে না। তাতে স্বভাব নষ্ট হবে। প্রতিটি টাকার পিছনে উপার্জনের হিসেব থাকা উচিত। তোমাদের কাজটার পর আমি হিসেব নিয়ে বসব। কতটা লোকের পিছনে খরচ হয়েছে, আমার পারিশ্রমিক কত হওয়া উচিত।"

কথার মাঝেই পার্স বের করে কিছু পাঁচশোর নোট হাতে নিয়েছে শৌর্য। আরশি বলে ওঠে, "আবার তুমি দিচ্ছ!"

হাতের ইশারায় আরশিকে থামিয়ে শৌর্য নবকৃষ্ণ কুণ্ডুকে বলে, "চার হাজার দিচ্ছি। বাড়ি গিয়ে প্রথমেই বউমার হাতে পাঁচশো দেবেন। চশমার দোকানে যাবেন সময় করে। পরের দেখায় চোখে যেন নতুন চশমা দেখতে পাই। বাকি টাকা দিয়ে আপনি খবর সংগ্রহ করতে থাকুন। টাকা ফুরোলেই জানাবেন। আপনি আমাদের জন্য যা করছেন, টাকা দিয়ে এর ঋণ শোধ হয় না। তাই কাজটার পর হিসেব নিয়ে বসতে হবে না আপনাকে।"

শৌর্যর দেওয়া টাকা প্যান্টের পকেটে ঢোকালেন নবকৃষ্ণবাবু। অন্য পকেটটা থেকে বের করলেন রুমাল। চশমা খুললেন। আরশি আন্দাজ করে উনি চোখ মুছবেন। সেটাই স্বাভাবিক। শৌর্যর কথায় আরশির চোখেও জল এসে গিয়েছে। কিন্তু আন্দাজ যে মিলল না। চোখ না মুছে চশমার কাচ মুছছেন নবকৃষ্ণ। মোছা শেষ করে পরে নিলেন চশমা। বললেন, "ঠিকই আছে। এখনই পালটানোর দরকার নেই। এই তো স্পষ্ট দেখছি তোমাদের। কী পরিষ্কার! আসলে বেশির ভাগ মানুষই আজকাল এত ঘোলাটে হয়ে গিয়েছে, নতুন চশমা পরেও কোন লাভ হবে না।"

শৌর্যর গা থেকে সিগারেটের কড়া গন্ধ আসছে। গা বলতে টি-শার্ট। বাইকে শৌর্যর পিছনে বসে গন্ধটা সহ্য করতে হচ্ছে আরশিকে। ইদানীং আর আমমুকুলের গন্ধটাও পাচ্ছে না কলকাতায়। কী করে পাবে! মায়ের সম্বন্ধে একের পর-এক যে সব খবর পাচ্ছে, সুবাস গ্রহণ করার স্নায়ুটা অকেজো হয়ে পড়েছে মনে হয়। নবকৃষ্ণবাবুর সঙ্গে কথা হওয়ার পর ফেরার রাস্তা ধরেছিল শৌর্য। হঠাৎই একটা চায়ের দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল। বলল, "মাথাটা জ্যাম হয়ে গিয়েছে। চা-বিড়ি না খেলেই নয়।"

"বিড়ি?" চমকে উঠে বলেছিল আরশি।

শৌর্য বলল, "আরে বাবা, সিগারেটকে আদর করে মাঝে-মাঝে ওই নামে ডাকা হয়। যেমন ধরো, ফুটফুটে ছেলে দেখে নাম রাখা হল কার্তিক। তার আদরের নাম অবধারিতভাবে কেত্তো হয়ে যাবে।"

"তোমার আদরের নাম, মানে ডাকনাম কী?" শৌর্যর কাছে জানতে চেয়েছিল আরশি।

শৌর্য বলল, "বাবানা।"

"মাসিমার মুখে এই নামটা তো একবারও শুনলাম না!" বিস্ময় প্রকাশ করেছিল আরশি।

মুচকি হেসে শৌর্য বলল, "ডাকে। প্রাইভেটলি। বাবা ডাকত বেশি।"

আরশির ডাকনাম নিয়ে চলে গিয়েছে মা। শৌর্য কথা প্রসঙ্গে সেটা জেনেছে। নতুন করে আর বলল না আরশি। দু'ভাঁড় চায়ের অর্ডার দিয়েছিল শৌর্য, আরশি খাবে কি না জিজ্ঞেস না করেই। খেল আরশি। চা শেষ করে শৌর্য দোকান থেকে একটা সিগারেট কিনে ধরাল। ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে গুছিয়ে নিল ভাবনা। বলল, "চলো, আজই রিহ্যাব সেন্টারটায় যাই। দেখি, আমাদের জন্য কী খবর অপেক্ষা করছে।"

"ছট করে যাওয়াটা কি ঠিক হবে? নবকষ্টবাবু বলেছেন সাবধানে এগোতে..." আশঙ্কার গলায় বলেছিল আরশি।

শৌর্য বলল, "উমেশবাবুর কথা ভেবে সাবধান করেছেন নবকৃষ্ণদা। ওই সেন্টারে প্রভাব আছে ওঁর। আমি ঠিক এই কানেকশনটা কাজে লাগাব। এখন কানেকশনের যুগ। যদি দেরি করি এবং উমেশবাবুর কানে পৌঁছে যায় আমরা রায়া সেনের খোঁজ করছি, সেন্টারকে কিছু বলতে বারণ করে দেবেন।"

"উমেশবাবুর কানে কে তুলবে আমরা মায়ের খোঁজ করছি?" অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিল আরশি।

শৌর্য বলল, "ইন্ডাস্ট্রির লোকগুলোই বলবে, যারা নবকৃষ্ণদাকে খবরগুলো দিচ্ছে। রায়া সেনের খবরের দাম আছে, বুঝে গিয়েছে ওরা। কাস্টমার পেলেই বিক্রি করবে। কোনও বাছবাছিতে যাবে না। আর কাস্টমার হিসেবে উমেশবাবু অনেক দামি। ইন্ডাস্ট্রির একটা স্তম্ভ, ওরা উমেশবাবুকে ফেভার করবে বেশি।"

এত মাথা খাটানোর ক্ষমতা আরশির নেই। তাই শৌর্যর সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছে। দু'জনে এখন চলেছে রিহ্যাব সেন্টারে। নবকৃষ্ণদার দেওয়া ঠিকানা অনুযায়ী সেন্টারটা সিঁথিতে। জায়গাটা কতদূর, জিজ্ঞেস করাতে শৌর্য বলেছে, "অনেকটাই দূর। পিছনে বসে ঘুমিয়ে পোড়ো না যেন! গাড়ির ব্যালেন্স রাখতে পারব না।"

ঘুম যে পাচ্ছে না, তা নয়। কতক্ষণে পৌঁছবে, আরশি সেই চিন্তাই করছে। শৌর্য কীভাবে কাজ উদ্ধার করবে, তারও কোনও আন্দাজ পাচ্ছে না। শৌর্য বলছে কানেকশনের কথা। সেটা কার সঙ্গে, কোন প্রক্রিয়ায় কাজে লাগায় দেখা যাক। একটা কথা অবশ্য ঠিক বলেছে শৌর্য, এটা কানেকশনের যুগ। তার হাতে

গরম প্রমাণ ক'দিন আগেই পেয়েছে আরশি। বাবা কত সহজে এবং আল্প সময়ে পৌঁছে গিয়েছিল শৌর্যদের বাড়ি। আরশি বারবার পূর্বার সঙ্গে কথা বলাচ্ছে না দেখে মনে কু ডেকেছিল বাবার। তাই সরাসরি পূর্বাকেই ফোন করে। পূর্বা আরশির থেকে যা শুনেছিল, সেটাই বলে। গোলপার্কে দূর সম্পর্কের পিসির বাড়িতে আছে আরশি। বাবা বুঝতে পারে মিথ্যে বলেছে মেয়ে। জলপাইগুড়ি পুলিশের সাহায্য চায় বাবা। কলকাতা না চেনা আরশি যেহেতু গোলপার্কের নাম করেছে, পুলিশ সেখান থেকেই শুরু করে খোঁজ। জলপাইগুড়ি থানা লেক থানার সঙ্গে যোগাযোগ করে। বাবার দেওয়া আরশির ফোটো মেল করে পাঠায়। লেক থানার পুলিশ প্রথমে সেই ফোটো পাঠায় আশপাশের হোটেল। তাতে সন্ধান না পেলে, আরও বড় এলাকা জুড়ে, অন্যভাবে খোঁজা হত। পুলিশকে বেশি খাটতে হল না। পার্ক স্টোর হোটেল আরশির ফোটো পেয়ে জানায়, সেখানেই ছিল মেয়েটি। পুলিশের কথা মতোই তাকে রাতে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। লেক থানার পুলিশ বের করে ফেলল, কোন ব্যক্তি আরশির জন্য সুপারিশ করেছিল। সুমিত ঘোষের নাম পাওয়া গেল। শৌর্যর সুমিতদাকে অন্তর্ধানের ব্যাপারে কিছু বলেনি পুলিশ, যেহেতু সুমিত যেন আরশির থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন, তিনিই আবার পালানোরও রাস্তা দেখিয়ে দিতে পারেন। সুমিত ঘোষের সঙ্গে কথা বলে শৌর্যর নাম-ঠিকানা পেয়ে গেল পুলিশ। বাবা তখন অত্যন্ত বিচক্ষণতার কাজ করেছিল। মেয়ের বদনামের কথা ভেবে লোক জানাজানি, হইচইয়ের মধ্যে যায়নি। পুলিশকে বলেছিল, "প্রথমে আমি ওই ঠিকানায় যাই। হতে পারে ওরা মেয়ের পূর্ব পরিচিত। হঠাৎ পুলিশ নিয়ে চড়াও হলে ওঁরা বিব্রত হবেন। মেয়েরও সেটা ভাল লাগবে না।" তারপরই বাবা ফোন করে পূর্বার বাবাকে। ফ্লাইট ধরে চলে আসে কলকাতায়। কাকুকে সঙ্গে নিয়ে পৌঁছে যায় শৌর্যদের বাড়ি। আরশির বাবার মুখ থেকে শৌর্য এই বৃত্তান্ত শোনেনি। শৌর্যদের বাড়িতে বসে বাবা যখন কথাগুলো মাসিমাকে বলছিল, শৌর্য ছিল না ঘরে। ড্রেস চেঞ্জ করতে গিয়েছিল। পরে মাসিমা ওকে সব বলেন। যখন বলছেন, আরশি মাসিমার পাশেই ছিল। সমস্তটা শুনে শৌর্য বলেছিল, এই হল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি। দশ বছর আগেও এতটা ছিল না।

আরশি উপলব্ধি করে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল না থাকার জন্যই মায়ের হারিয়ে যেতে সুবিধে হয়েছিল। যোগাযোগ ব্যবস্থার কি ততটাই উন্নতি হয়েছে, বহুদিন আগের নিখোঁজ মানুষকে খুঁজে দেবে?

রি-হ্যাব সেন্টারটার নাম 'প্রেরণা'। বাগানসমেত পুরনো দোতলা বাড়ি। খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বাগানে একটা গাছের পাতাও পড়ে থাকতে দেখা যায়নি। ব্যাপারটা একটু অতিরিক্তই মনে হচ্ছিল। বাড়াবাড়ি আর একটা জায়গাতেও, বাউন্ডারি পাঁচিলের গেটে তো বটেই, বারান্দার কোল্যাপসেব্‌ল গেটেও ভিতর থেকে বড় সাইজের তালা মারা। মূল গেটের পিলারে ডোরবেলের সুইচ। সেটা টেপার পর বারমুডা-স্যান্ডো গেঞ্জি পরা বছর বাইশের একটি ছেলে বারান্দায় এল। দূর থেকেই জরিপ করল আরশিদের। তারপর এক-এক করে বারান্দা আর গেটের তালা খুলল। অত্যন্ত নিস্পৃহ গলায় জানতে চাইল, বলুন, "কী ব্যাপার?"

শৌর্য বলেছিল, "একজন পেশেন্টকে এখানে রাখতে চাই। সেটার জন্য খোঁজ নিতে এসেছি।"

"ভিতরে আসুন," বলে ডেকে নিয়েছিল ছেলেটি।

একতলার সামনের ঘরটাই এদের অফিস। এখন যেখানে বসে রয়েছে আরশিরা। ম্যানেজারের সঙ্গে প্রাথমিক কথাবার্তা হয়ে গিয়েছে শৌর্যর। লোকটি শৌর্যর থেকে একটু বড়, ইয়ং ছেলেই বলা যায়। ম্যানেজার এখন সিটে নেই। শৌর্যকে নিজেদের প্রতিষ্ঠানের ব্রোশিওর দেখতে দিয়ে ভিতরে গিয়েছে।

শৌর্য যে কানেকশনের কথা বলেছিল, সেটা যে এতটাই ভিত্তিহীন, কল্পনাও করতে পারেনি আরশি। অফিসে ঢুকে সপ্রতিভভাবে ম্যানেজার সঙ্গে হ্যান্ডশেক সারল শৌর্য। নিজের কার্ড দিল ম্যানেজারকে। বলল, "প্রোডিউসার উমেশবাবুর মুখে আপনাদের সেন্টারের কথা শুনেছিলাম।"

একদম ম্যাজিকের মতো কাজ করল রেফারেন্সটা। ম্যানেজার ছেলেটি খাতিরের গলায় বলল, "ও আচ্ছা, আচ্ছা। বসুন।"

শৌর্য, আরশি চেয়ারে পাশাপাশি বসল। শৌর্য বলল, "সিনেমায় স্টিল ফোটো করি তো, সেই সূত্রেই উমেশবাবুর সঙ্গে আলাপ।"

"হ্যাঁ, সে তো আপনার কার্ড দেখেই বুঝেছি, বলুন, আপনাদের জন্য কী করতে পারি?" বলেছিল ছেলেটি।

শৌর্য বলল, "আমাদের এক কমনফ্রেন্ড মদের নেশায় আসক্ত। কিছুতেই নেশা ছাড়ানো যাচ্ছে না। এক পার্টিতে উমেশবাবু কাকে যেন বলছিলেন আপনাদের সেন্টারের কথা। সেই লোকটির চেনা কেউ মদের নেশায় অ্যাডিক্টেড। পাশে ছিলাম আমি। উমেশবাবু বললেন, মদের নেশা ছাড়ানোর জন্য আপনাদের সেন্টার আদর্শ জায়গা। ওঁর কোনও এক আত্মীয়কে এখানেই রেখেছিলেন।"

"হ্যাঁ, ঠিক... তবে ওঁর মদের নেশা ছিল না, মাদকের নেশা, হেরোইন..." বলেছিল ম্যানেজার। আরশি হকচকিয়ে গিয়েছিল। ম্যানেজার আরও বলছিল, "এই ধরনের ড্রাগ অ্যাডিক্টরাই আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।"

"মানে, মদের নেশার চেয়েও খারাপ? পেশেন্টকে সুস্থ করা কঠিন?" জানতে চেয়েছিল শৌর্য।

ম্যানেজার বলল, "সব নেশাই খারাপ। মদ ছাড়ানো বরং বেশি কঠিন। যেহেতু মার্কেটে ইজিলি অ্যাভেলেবল। ড্রাগ অ্যাডিক্টদের নিয়ে সমস্যা একটাই, নেশার ক্যারেক্টারটা এমনই, আসক্ত মানুষটিকে ক্রমশ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। কারও সঙ্গে মিশতে চায় না। টাকার জোগান না থাকলে চুরি-ছিনতাই কিংবা ভিক্ষে করতেও পিছপা হয় না সে। নেশা করার পর নিজের জগতে বুঁদ হয়ে যায়। সেই জগতটা এতটাই আনরিয়েল, পেশেন্টকে মূলস্রোতে মেশানো মুশকিল হয়ে যায়।"

ভিক্ষার অনুষঙ্গে আরশির মনে পড়ে যায় পার্ক সার্কাসের হোটেলের বাইরে দুই মহিলা ভিখারির কথা। শৌর্য বলেছিল "ওরা সবাই আসল ভিখারি নয়। নেশার টাকা জোগাড়ের জন্য ভিক্ষে করে।" মা কি ওদেরই মতো হয়ে গিয়েছে?

ম্যানেজার আরও বলে যাচ্ছিল, "হেরোইন বা ওই জাতীয় নেশা থেকে রোগীকে যদি একবার সুস্থ করা যায়, ফেরানো যায় বাস্তব জীবনে, তার প্রতি যত্ন এবং গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখলে, নতুন করে নেশার কবলে পড়ার চান্স কম থাকে। যেহেতু নেশার বস্তুগুলো চোরাপথে সংগ্রহ করতে হয়। বাড়ি বয়ে দিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি নেয় না ড্রাগ পেডলাররা। মদের বেলায় উলটো, আশপাশে হামেশাই চলছে মদের আসর। রোগী সুস্থ হওয়ার পরও জড়িয়ে পড়ার চান্স থাকে। অথচ হেরোইনের নেশাটাকে লোকে বেশি ভয়ংকর মনে করে।"

শৌর্য জিজ্ঞেস করেছিল, "আপনারা কী পদ্ধতিতে নেশা ছাড়ান?"

ম্যানেজার বলেছিল, "প্রথমে তো পেশেন্টকে মেডিসিন দিয়ে ডিটক্সিফিকেশন করতে হয়। অনেক সময় হাসপাতাল থেকে করিয়ে নিয়ে আসে পেশেন্ট পার্টি। ডিটক্সিফিকেশন হচ্ছে ডিঅ্যাডিকশনের একটা পার্ট। উইথড্রল সিস্টেমের কষ্টটা হয় না। রোগী যখন ধাতস্থ হয়ে আসে আমরা তার সুস্থ জীবনচর্যার ব্যবস্থা করি।"

আরশি জানতে চায়, ব্যবস্থাটা কীরকম।

"এই যেমন ধরুন, নেশা-আসক্তরা নিজের কাজ, নিজেরা করতে চায় না। ড্রাগ অ্যাডিক্টরা তো হাতে করে খাবারটুকু খেতে আলস্য বোধ করে। বাড়ির লোকই প্রথমে তাদের অভ্যেসটা নষ্ট করে দেয়। স্নান করতে চায় না যে-কোনও নেশা-আসক্তই। আমরা তাদের বুঝিয়ে, বকে-ধমকে জীবন অভ্যেস ফেরানোর চেষ্টা করি। যেহেতু নেশার উপকরণ হাতের কাছে নেই, উপায় নেই নেশা করার, ওরা ধীরে-ধীরে আমাদের নির্দেশে সাড়া দেয়। নিয়মিত ক্লাস নিই আমরা, মনীষীদের বাণী, জীবনী পড়ে শোনাই। হোমের চৌহদ্দির মধ্যেই ইনডোর, আউটডোর গেমস-এ ওদের ইনভল্ভ করি। ওরাই গোটা হোমটা ঝাঁট দিয়ে ধুয়ে মুছে রাখে।"

ম্যানেজারের এই কথায় আরশি বুঝতে পারে, সেন্টারটা কেন এত পরিষ্কার। শৌর্য জিজ্ঞেস করে, "পেশেন্টের জন্য কত দিতে হবে আপনাদের? মানে চার্জ কেমন?"

"এটা তো একটু লং প্রসেস, তাই চার্জটা আমরা মান্থলি হিসেবে ধরি। দশ হাজার ধরা আছে, সবাই তো দিতে পারে না। প্রত্যেকের বাড়ির অবস্থা সমান নয়। কিন্তু আমাদের কাছে সমস্ত রোগীই সমান। পরিবারের আর্থিক দিকটা বিচার করে চার্জ কমাতে হয়। তিন-চার হাজার টাকার চার্জে এখানে অনেক পেশেন্টই আছে। যতই হোক এটা তো একটা সেবা প্রতিষ্ঠান। প্রফিট ওরিয়েন্টেড বিজ়নেস নয়।"

শৌর্য জিজ্ঞেস করল, "সেবার টাকাটা আসে কোথা থেকে? আপনি যে চার্জটার কথা বললেন, এটাতে একজন পেশেন্টের ভরণপোষণ সম্ভব নয়, তারপর তো আপনাদের খরচও আছে।"

"উমেশবাবুর মতো কিছু মানুষজন আছেন, তাঁরা সাহায্য করেন। এক প্রকার এনজিও বলেই মনে করতে পারেন আমাদের। সরকারি সাহায্য এখনও পাই না। পেলে চার্জ আরও কমাতে পারব। তবে কিছু খরচ থেকে আমরা রেহাই পাই। ঝাড়াই-বাছাই তো শুনলেন, এখানকার আবাসিকরা করে। রান্না-বান্না, কাপড়কাচা, বাজার দোকান, সব এরাই সামলায়। যারা অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে, তাদের দিয়েই একমাত্র বাইরে কেনাকাটির কাজগুলো করাই। অসুস্থ অবস্থায় পেশেন্টরা পালানোর চেষ্টা করে। তাই গোটা হোম তালা দিয়ে রাখতে হয়। চাবি থাকে আমাদের মতো রিকভার করা পেশেন্টের কাছে।"

তালার রহস্য খুলে গেলেও অন্য একটা ধাঁধা চলে এল সামনে। আরশি সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করেছিল, "আপনিও পেশেন্ট ছিলেন?"

নির্মল হাসি উপহার দিয়ে ম্যানেজার বলল, "এখানকার সমস্ত কর্মচারীই এক সময় কোনও না-কোনও নেশায় অ্যাডিক্টেড ছিল। এই ধরনের হোমে তারা সুস্থ হয়েছে। এমনকী যিনি আমাদের হেড, তিনিও নেশামুক্ত হন এভাবেই। রোগীকে সুস্থ জীবনে ফেরানো যে সম্ভব, এটা আমরাই সবচেয়ে ভাল বুঝি। যেহেতু ওই অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমরা গিয়েছি।"

"আপনাদের হেড কে? তিনি কি এখানেই থাকেন?" শৌর্যর প্রশ্ন শেষ হতে না-হতেই এক মহিলার চিৎকার ভেসে এসেছিল। বুক কাঁপিয়ে দেওয়া শব্দ। সিট ছেড়ে উঠে পড়ল ম্যানেজার। কাঁচুমাচু মুখে বলেছিল, "একটু বসতে হবে কিন্তু। মেয়েদের সেক্টরে লোক কম। আমাকেই দেখতে হবে এটি। ইনি নতুন পেশেন্ট, দিনচারেক হল এসেছেন।"

শৌর্য বলল, "আওয়াজটা দোতলা থেকে এল মনে হল..."

"হ্যাঁ, দোতলাটা ফিমেল সেক্টর, একদম সেপারেট... আপনি ততক্ষণ আমাদের ব্রোশিওরটা দেখুন, আরও অনেক কিছু জানতে পারবেন, আমি আসছি ঘুরে..." বলে সেই গিয়েছে ম্যানেজার আধঘণ্টা বোধ হয় হল, ফেরার নাম নেই। শৌর্য মন দিয়ে ব্রোশিওরটা পড়ে যাচ্ছে। সংসার ছেড়ে যাওয়ার পর মা এখানে কিছুদিন ছিল, এটা ভেবেই কেমন যেন রোমাঞ্চ বোধ করছে আরশি। ইচ্ছে করছে দোতলাটায় যেতে। ওখানে নিশ্চয়ই এমন জানলা আছে, যার সামনে দাঁড়িয়ে মা আরশি, না, না, কুমুর কথা ভাবত। এখান থেকে আবার কোথায় যে চলে গেল!

ফিরে এল ম্যানেজার। হাসিমুখে শৌর্যকে বলল, "পড়লেন ব্রোশিওরটা?"

"হ্যাঁ, এ তো বিরাট ব্যাপার। শুধু এই হোম নয়, এর সঙ্গে আরও অনেক রিহ্যাব সেন্টার জড়িয়ে আছে। প্রত্যেক মাসে একটা করে মিট হয় আপনাদের। নেশামুক্তির পর কে কেমন আছে, কী করছে, অ্যাডিক্টেডদের জন্য আর কী করা যায়, এই সব নিয়ে আলোচনা হয়। খাওয়াদাওয়া হয় সকলে মিলে। আপনাদের হোমের ডিরেক্টর তো মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির বড় পোস্টে আছেন। নেশার কারণে চাকরি থেকে সাসপেন্ড হয়েছিলেন। এরকমই একটা রিহ্যাবে থেকে সুস্থ হন। কোম্পানি ফের চাকরিতে বহাল করে। নিজের জীবন অভিজ্ঞতা থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই হোমটা গড়ার পরিকল্পনা করেন।"

গর্বের হাসি হাসছে ম্যানেজার। শৌর্যর নড়াচড়া দেখে মনে হচ্ছে এবার উঠবে। বলে ওঠে, "ঠিক আছে, আমরা তো গোটা ব্যাপারটা বুঝে নিলাম, বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে আলোচনা করি। দেখি, ওর গার্জেনরা কী ডিসিশন নেয়।"

"হ্যাঁ, দেখুন..." বলার পর কিছু একটা মনে পড়ল ম্যানেজারের, বলল, "আর-একটা কথা বলে রাখি, নেশা-আসক্তরা বেশির ভাগই হোমে আসতে চায় না। জোর করে নিয়ে আসার লোক আমাদের আছে। মানে মাস্‌ল্‌ম্যান টাইপের। যদিও অনেক গার্জেনই চায় না তাদের সন্তানকে ওভাবে নিয়ে যাওয়া হোক। পাড়ার লোক দেখবে। এটা তাদের কাছে লজ্জার। সন্তান নেশা করে সেটা লজ্জার নয়, দুর্ভাগ্যের। সে যাই হোক, গার্জেন যদি চায় আমরা মাঝরাতে লোক পাঠিয়ে ঘুমন্ত পেশেন্টকে তুলে আনতে পারি। প্রয়োজনে ঘুমের ইনজেকশন দিয়ে নেব। পেশেন্টের ঘুম ভাঙবে অচেনা পরিবেশে, মানে আমাদের এখানে। চেঁচামেচি করতে পারে পেশেন্ট, আমরা ঠিক সামলে নেব। ও নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। লিফটিয়েরর খরচটা কিন্তু আলাদা দিতে হবে।"

"ওকে, ফাইন! এবার উঠি তা হলে?" বলেও উঠল না শৌর্য। টেবিলের উপর সামান্য ঝুঁকে পড়ে বলল, "ছোট্ট একটা কৌতূহল আছে।"

"বলুন না, হেজ়িটেট করছেন কেন?" বলল ম্যানেজার, শৌর্য বলে, "যতদূর শুনেছি উমেশবাবুর পেশেন্ট অভিনেত্রী রায়া সেন এখানে ছিলেন। উনি কি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরেন? পরে কিন্তু আর কোনও সিনেমায় দেখা যায়নি?"

আরশি কান খাড়া করে রাখে উত্তরের জন্য। ম্যানেজার বলে, "ওঁর ব্যাপারটা এই হোমের একটা বিরাট শিক্ষা। আমি অবশ্য তখন ম্যানেজার ছিলাম না। এমনকি পেশেন্ট হিসেবেও অ্যাডমিটেড হইনি। ঘটনাটা শুনেছি আগের ম্যানেজারের থেকে। রায়া সেন থাকানে এসে খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠেন। হোমের লোকেদের অন্তত তাই মনে হয়েছিল। সকলের সঙ্গে দারুণ ভাব। হোমের সব কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া, অন্য পেশেন্টের খেয়াল রাখা, এই সব দেখে ম্যানেজার ওঁর হাতে গেটের চাবি তুলে দেন। তখন ছেলেদের সেক্টরেও রায়া সেনের অবাধ যাতায়াত। একদিন ভোরবেলা দু'টো গেটের তালা লাগিয়ে উধাও হয়ে গেলেন। তালা মারার কারণ, যাতে চট করে বেরিয়ে পড়তে না পারে হোমের কর্মচারীরা। থানায় ফোন করা হল। পুলিশ এসে তালা ভাঙল, রায়া সেনের ডিটেলস নিয়ে খোঁজ শুরু করল পুলিশ। রায়া সেন ততক্ষণে ধরাছোঁয়ার বাইরে। এটাই মাদকাসক্তদের নিয়ে সমস্যা, বাইরে থেকে সহজে বোঝা যায় না কতটা সুস্থ হয়েছে।"

"ভাল করে খুঁজে ছিল তো পুলিশ?" বলে ফেলেই আরশি বুঝল ভুল হয়ে গেল। রায়া সেনের ব্যাপারে বাড়তি কৌতূহল দেখে মনে সন্দেহ জাগতে পারে ম্যানেজারের। শৌর্য দ্রুত সামাল দিল পরিস্থিতি। বলল, "উনি অত কিছু কী করে জানবেন? তখন তো এই হোমে আসেনইনি! সবটাই শুনেছেন অন্যের মুখে।"

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল শৌর্য। দেখাদেখি আরশিও। শৌর্য দু'হাত দিয়ে ম্যানেজারের হাত ধরে বলল, "আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। অনেকটা সময় দিলেন আমাদের। আশা করছি আবার দেখা হবে।"

"ধন্যবাদ দেওয়ার কিছু নেই, এটাই আমাদের কাজ... আমরা চাই আপনারাও আমাদের পাশে থাকুন," হাত ফেরত নিতে-নিতে বলল ম্যানেজার।

দরজার দিকে ঘুরতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল শৌর্য। বলে ওঠে, "বাই দ্য ওয়ে, আপনার নাম তো জানা হল না।"

"রাজপুত্র গোস্বামী।"

থমকাল শৌর্য। আরশিও হোঁচট খেয়েছে। শৌর্য বলে, "সত্যিই এটা আপনার নাম, নাকি ছদ্মনাম?"

"এটাই নাম। বাবা দিয়েছিল। অনেকেই বাবাকে প্রশ্ন করত, 'কেন এমন অদ্ভুত নাম রাখলে ছেলের?' বাবা হাসতে-হাসতে বলত, 'রাজা তো হতে পারব না কোনওদিন, তাই ছেলের ওই নাম রেখে রাজা হয়ে গেলাম!' আসলে বাবা আমাকে রাজার ধনের মতোই আগলে রাখত। নেশা করে বাবাকে নিঃস্ব করলাম আমি। আমার সুস্থ হয়ে ওঠাটা দেখে যেতে পারেনি বাবা। তার আগেই চলে গেল পৃথিবী ছেড়ে।"

"আই অ্যাম সো সরি! প্রশ্নটা না করলেই হত," বলল শৌর্য।

ম্যানেজার বলে," না, না, তাতে কী আছে! তবে রাজপুত্র নামটা তেমন চালু নয়। রাজু নামেই সকলে চেনে। আপনারা 'রাজু' নামটাই মনে রাখবেন।"

হোম থেকে বেরিয়ে এসেছে আরশিরা। বাইরে ঝাঁ ঝাঁ রোদ, আরশির মন মেঘলা। মা কেন সুস্থ হওয়ার পথ ছেড়ে পালালো? এদিকে ম্যানেজার সুস্থ হয়েও অনুতাপের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে। নেশা কী পরিমাণ ধ্বংসাত্মক এখানে এসে টের পেল আরশি।

শৌর্য বাইকে উঠতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। একটা অ্যাম্বুলেন্স ঢুকছে এই রাস্তায়। আওয়াজ করে নয়, নিঃশব্দে। আরশি বলে, "কী হল, দাঁড়িয়ে পড়লে কেন? রাস্তা তো চওড়া, পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যাবে।"

"অ্যাম্বুলেন্সটা মনে হচ্ছে এই সেন্টারেই আসছে।"

"কী করে বুঝলে?"

"মনে হচ্ছে হসপিটাল থেকে ডিটক্সিফিকেশন করে পেশেন্টকে এখানে রাখতে আসছে। যেহেতু সিরিয়াস পেশেন্ট নয়, সাইরেন বাজাচ্ছ না।"

শৌর্যর কথা শেষ হওয়ার আগেই সেন্টারের গেট থেকে একটু এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল অ্যাম্বুলেন্স। খুলে গেল পিছনের দরজা। শৌর্যর অনুমান সঠিক প্রমাণ করে নেমে আসছে তিনজন। মাঝেরজন ইয়ং, ড্রাউজি অবস্থায় রয়েছে। বাকি দু'জন ধরে আছে তাকে। ঝিমিয়ে থাকা ছেলেটিই যে পেশেন্ট, বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। ড্রাইভার কেবিনের বাঁদিকের দরজা খুলে নামল একটি মেয়ে। পরনে নার্সের পোশাক। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ডোরবেলের সুইচ টিপল মেয়েটি। বাইকের কাছে দাঁড়ানো শৌর্য মেয়েটির উদ্দেশে গলা তোলে, "আরে, তুমি!"

ঘুরে তাকাল মেয়েটা। শৌর্যকে দেখে অবাক! একমুখ হাসি ছড়িয়ে পড়ল মুখে। গেট খুলে দিয়েছে সেন্টারের ছেলেটা। পেশেন্ট নিয়ে ঢুকে যাচ্ছে দু'জন। মেয়েটা শৌর্যর সামনে এসে বলল, "জানতাম এভাবেই দেখা হবে। তা এখানে কেন?"

"এক বন্ধুকে অ্যাডমিট করব, তাই খবর নিতে এসেছি। তুমি মনে হচ্ছে ভর্তি করাতে এলে পেশেন্টকে?"

ধাতস্থ হয়ে মেয়েটি বলল, "হ্যাঁ, হাসপাতাল থেকে পাঠাল আমাকে দায়িত্ব দিয়ে। আগেও এসেছি।"

"যাবে না ভিতরে?"

"একটু পরে গেলেও চলবে। কয়েকটা জায়গা সই করতে হবে শুধু।"

কথা শেষ করার পর মেয়েটির চোখ গেল আরশির দিকে।

শৌর্য বলল, "আমার বন্ধু, আরশি।"

হাত নেড়ে 'হাই' বলল আরশি। মেয়েটি বলল, "হ্যালো, আমি নবমী।"

আরশি কিছু বলতে যাবে, নবমী মুখ ঘুরিয়ে নিল শৌর্যর দিকে। গাঢ় গলায় বলল, "আমার জার্নির কী হল? কবে বেরবে?"

"খুব তাড়াতাড়িই একবার ওই পথে যেতে হতে পারে মনে হচ্ছে। আগের বারের ফোটো কাজে লাগেনি। নতুন করে তুলতে হবে।"

"কবে যাবে বোলো প্লিজ। আমি ঠিক ছুটি ম্যানেজ করে ফেলব। আমাদের বাড়িতেও নিয়ে যাব তোমাকে। বাড়ির লোক অবাক হবে খুব।"

"যাব, যাব। শেডিউল তৈরি হোক, ডেটটা জানাব।"

"যদি না জানিয়ে চলে যাও, তখন দেখবে কী করি।"

"কী করবে? তোমার সঙ্গে তো আমার দেখাই হয় না!"

"কে বলেছে হয় না! হামেশাই দেখা হয়ে যায়। বাসস্টপে, হাসপাতালের করিডোরে, নাইট ডিউটির রাতে চোখ বুজে এলে তোমার সঙ্গে কথা বলে ঘুম তাড়াই। তোমার ভুলো মন, তাই কিছু খেয়াল থাকে না।"

"বুঝেছি। তুমি ভুলেও এই সেন্টারে ঢুকো না। ভর্তি করে নেবে।"

"সারাতে পারবে না। আমি এমন একজনের নেশায় বুঁদ, আরোগ্যের কোনও রাস্তা নেই।"

হেসে ফেলে শৌর্য বলে, "সত্যি নেই।"

বাইকে উঠে পড়েছে শৌর্য। আরশি পিছনে গিয়ে বসে। গাড়ি

স্টার্ট দিয়ে 'চলি' বলে এগিয়ে যায় শৌর্যরা। ওরা চোখের বাইরে যাওয়া অবধি তাকিয়ে থাকে নবমী, মুখ ঘুরিয়ে সেন্টারে ঢুকতে যাবে, দেখে, পাঁচিলের উপর রাখা একটা হেলমেট। চিনতে পারে নবমী। হেলমেটটা যে তারই কেনা। একটা সরল হাসি ফুটে ওঠে মুখে। মনে-মনে বলে, 'সো সুইট!'

● ৯ ●

মহুলিয়ার বিকেল ভীষণ কুঁড়ে। ফুরোতেই চাইছে না। মলয়দার বাড়ির বিছানায় বসে জানলার বাইরে চোখ রেখেছে আরশি। দুই বিনুনির স্বর্ণতোয়া আরশির সামনে বসে অঙ্ক কষছে। কিছুই করার নেই বলে ওকে পড়াতে বসেছে আরশি। খানিক আগে উঠোনে দু'টো ছাগলছানার সঙ্গে খেলছিল মেয়েটা। বিকেলের রোদে তখন হলুদ আভা। উঠোনের ধুলোও যেন রঙিন। বাড়ির সীমানায় গোলাপি করবী আর গেরুয়া পলাশ। চারপাশে এত রং কেন? কাল দোল বলেই কি? মহুলিয়ায় অবশ্য দোলের দিন রং খেলা হয় না। পরের দিন, মানে হোলির দিন হয়। মহুলিয়া পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে হলেও যেহেতু ঝাড়খণ্ডের বর্ডারে, হিন্দিভাষীদের রীতি-রেওয়াজই চলে।

এখানে আরশির আসার কোনও কথাই ছিল না। জেদ ধরে এসেছ। প্রেরণা রিহ্যাব সেন্টার থেকে ফেরার সময় শৌর্য বলেছিল, "বহুত খিদে পেয়েছে। কাছাকাছি একটা ধাবা আছে। সেরকম ঝকঝকে কিছু নয়, তোমার অসুবিধে হবে না তো খেতে?"

"তোমার অসুবিধে না হলে, আমার কেন হবে? আমি কি কোটিপতির মেয়ে?" বলেছিল আরশি।

হেসে ফেলে শৌর্য বলল, "টাকাপয়সার ব্যাপার নিয়ে তোমার যে কোনও ধারণা নেই, এতেই বোঝা যায়। অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে কেউ আর 'কোটিপতি' কথাটা ব্যবহারই করে না। এখন প্রত্যেক পাড়ায় দু'চার বাড়ি অন্তত কোটিপতি। আমি শিওর তুমি কোটিপতিরই মেয়ে।"

কথা বাড়ায়নি আরশি। বৈষয়িক ব্যাপারে সত্যিই তার কোনও জ্ঞান নেই। ধাবায় খেতে বসেছিল ওরা। তখন প্রায় দুপুর দেড়টা। খিদে আরশিরও পেয়েছিল। ধাবাটা খুব একটা পরিষ্কার নয়। খিদের সময় অত কিছু দেখলে চলে না। ওখানে বসেই নবকৃষ্ণবাবুকে ফোন করেছিল শৌর্য, 'প্রেরণা' রিহ্যাব সেন্টার থেকে যা জানা গিয়েছে সব বলল। খাওয়া শেষ করে ধাবা থেকে বেরিয়ে শৌর্য যখন বাইকে ঝোলানো হেলমেট নিয়ে পরতে যাচ্ছে, থমকে গিয়েছিল। বলল, "তোমার হেলমেটটা কোথায় গেল? এখানেই রেখেছিলে তো?"

'যার হেলমেট, তাকে ফেরত দিয়ে এসেছি' বলেনি আরশি। আশ্চর্য হওয়ার ভান করে বলেছিল, "বাইকেই তো রেখেছিলাম!"

শৌর্য বলল, "দেখেছ কাণ্ড, চোখের সামনে রেখেছি গাড়িটা, হেলমেটটা নিয়ে পালাল!"

খানিক দূর গিয়েই একটা গ্যারেজ থেকে আরশির জন্য হেলমেট কিনেছিল শৌর্য। বাইকে যেতে-যেতে আরশি বলেছিল, "নবকৃষ্ণবাবুকে ইনফর্মেশনগুলো তো দেওয়া হল। এরপর আমাদের করণীয় কী?"

শৌর্য বলেছিল, "অপেক্ষা। নবকৃষ্ণদা কী খবর আনে দেখে নিই। ওই রাস্তা ধরে এগোতে হবে। হ্যাণ্ডমলি খোঁজ শুরু করলে গুলিয়ে যাবে গোটা ব্যাপারটা।"

কথাটা যুক্তিসঙ্গত মনে হয়েছিল আরশির। পরের দুটো দিন পূর্বাদের বাড়িতে শুয়ে-বসে কাটল আরশির। নবকৃষ্ণবাবুকে ফোন করে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছিল, কাজ কতদূর এগোল। পরক্ষণই মনে হচ্ছিল মানুষটাকে ব্যস্ত করা ঠিক হবে না, যথেষ্ট সিনসিয়ার। কোনও খবর হলেই শৌর্যকে জানাবেন। শৌর্য ফোন করবে আরশিকে। ফোন করল শৌর্য, তবে মায়ের খবরের জন্য নয়। বলল, মহুলিয়ায় যেতে হবে। সুমিতদা অদ্ভুত একটা বায়না ধরেছে। মহুলিয়ার সেই বাড়ির মালিককে বলতে হবে আপনার বাড়িটাকে রংচটা করে দেব। সেটের লোক দিয়ে বাড়ির গায়ে শ্যাওলার দাগ, পাঁচিল ফাটিয়ে গাছ লাগানো হবে। প্লাস্টিকের গাছ। যতটা সম্ভব পুরনো লুক দিতে হবে বাড়ির। তার জন্য বাড়ির যা ক্ষতি হবে, টাকার বিনিময়ে পূরণ করা হবে সেটা। ওঁরা বাড়িটা সরাই করে নিতে পারবেন। সুমিতদা বলছে, যে করে হোক ওদের কনভিন্স করতে হবে আমাকে। প্রোডিউসর ধরে রাখার এটাই একমাত্র উপায়।

প্ল্যানটা সত্যিই অদ্ভুত। কেমন যেন বানানো মনে হচ্ছিল আরশির। এটা কি কোনও অজুহাত? শৌর্য নবমীকে নিয়ে ওই পথে যাবে বলে বানিয়েছে? সুমিত ঘোষকে ফোন করে সত্যিটা জানা যাবে না। বাড়ি পুরনো করার প্ল্যানটা হয়তো শৌর্যই দিয়েছে ওঁকে। উনি এতটাই হতাশ, শৌর্যকে বলেছেন, "দ্যাখ যদি রাজি করাতে পারিস।"

আরশি জানতে চেয়েছিল, "কবে যাবে?"

"ভাবছি কাল সকালেই বেরিয়ে যাব," বলেছিল শৌর্য।

আরশি বলল, "আমিও যাব।"

শৌর্য অবাক হয়ে বলেছিল, "তুমি গিয়ে কী করবে? তোমার ওখানে কী কাজ?"

"ঘুরতে যাব। বাড়িতে বসেই আছি এমনি-এমনি। ঘুরে আসি নতুন জায়গায়।"

শৌর্য কিছুতেই রাজি নয়। বলতে থাকে, "কোনও মানে হয় না বাইকে অতদূর জার্নি করার। যাতায়াত প্রায় পাঁচশো কিলোমিটার। এমনিতে যথেষ্ট ঘোরাঘুরি যাচ্ছে তোমার। একটু রেস্ট নাও।"

আরশি জেদ ধরল, "আমি যাবই।"

"যদি না নিয়ে যাই?" বলেছিল শৌর্য।

আরশি বলল, "দেখবে কী করি... নিয়ে তোমাকে যেতেই হবে।"

"যা ইচ্ছে করে নাও। তোমায় নিয়ে যাচ্ছি না আমি। এমনিতে এক রাত কাটাতে হবে ওবাড়িতে। গতবার রিকোয়েস্ট করেছিল থাকতে, থাকিনি। এবার গিয়ে থাকব। আরও কাছাকাছি যেতে পারব ওদের। প্রস্তাবটায় রাজি করাতে সুবিধে হবে আমার। মাঝে তুমি ঢুকে গেলে, অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।"

কথা শেষ করে ফোন কেটে দিয়েছিল শৌর্য।

আজ ভোরবেলা রুকস্যাকে নিজের সমস্ত লাগেজ পুরে পূর্বাদের বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল আরশি। কারসার্ভিস অ্যাপ থেকে ট্যাক্সি ডেকে পৌঁছেছিল পূর্বা। জিজ্ঞেস করেছিল, "কাকু ফোন করলে কার সঙ্গে, কোথায় গিয়েছিস বলব তো?"

"বলিস," বলেছিল আরশি। ট্যাক্সি পৌঁছে গেল শৌর্যদের বাড়ি। দরজা শৌর্যই খুলল। রেডি হচ্ছিল বেরনোর জন্য। ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে আরশি বলেছিল, "নবমীকে বলে দাও, ওর যাওয়া হচ্ছে না।"

"এতক্ষণে বুঝলাম, কেন এত জেদ করছিলে!" বলল শৌর্য। চা-বিস্কুট খেয়ে বেরিয়ে পড়েছিল দু'জনে। মাসিমা বলছিলেন,

ব্রেকফাস্ট সেরে বেরতে। শৌর্য বলল, "ছেড়ে দাও। অনেকটাই রাস্তা। মাঝে কোথাও খেয়ে নেব।"

কলকাতা পার করে হাইওয়ের দু'পাশে যখন ধূ ধূ মাঠ, বাইক চালাতে-চালাতে শৌর্য বলেছিল, "সুমিতদা এখানকার কাজটা দেওয়ার পর আমি কিন্তু সত্যিই নবমীকে ফোন করে বলেছিলাম আমার সঙ্গে যেতে। আগ্রহ দেখাল না। আর্জেন্ট কাজের অজুহাত দিল। তুমি কি কলকাঠি নেড়ে রেখেছ কিছু?"

"কী করে নাড়ব? আমার কাছে কি ওর ফোন নম্বর আছে? ওই দিনই তো সামান্য যা একটু আলাপ হল, আমাকে তেমন পাত্তাও দেয়নি!" বলেছিল আরশি।

শৌর্য বলল, "তা অবশ্য ঠিক। তা হলে তুমি কী করে ধরে নিলে ওকে সঙ্গে নিতে পারি। ওর ব্যাপারে তোমাকে তো বিশেষ কিছু বলিনি।"

"রিহ্যাব সেন্টারের বাইরে তোমাদের প্ল্যানপ্রোগ্রাম তো শুনলাম! নবকৃষ্ণবাবুর বাড়ি থেকে বেরনোর পর যখন ফোন এসেছিল মেয়েটার, বাইকে বসে ফোনের অনেক কথাই শুনেছি, সহ্য না করতে পেরে নেমে গিয়েছিলাম। এরপর কি বুঝতে কিছু বাকি থাকে?" বলেছিল আরশি। শৌর্য ওর কথায় হাসতে থাকে। আরশির আত্মনিবেদনকে সিরিয়াসলি নিচ্ছে না শৌর্য। এমন ভাব করছে, যেন ভালবাসা দু'জনের খেলার সামগ্রী। শৌর্য ধরে নিচ্ছে আরশি যে অ্যাটেনশনটা তার প্রতি দিচ্ছে, সেটা আসলে

নির্ভরতা। মাকে খুঁজে পেতে শৌর্যর সাহায্য ভীষণ দরকার। তাই আরশি প্রেমে পড়ার ভান করছে।

সত্যিই কি তাই? আরশির অবচেতন মনে এরকম কোনও উদ্দেশ্যই কি কাজ করছে? আরশিও জানে প্রেম শর্তসাপেক্ষে হয় না। স্কুল-কলেজের বন্ধুদের দেখেছে ভাল লাগা থেকে কত মধুরভাবে তাদের সম্পর্ক বদলে যাচ্ছে ভালবাসায়। তার জন্য আয়োজনের শেষ নেই তাদের। সাজ-পোশাক পালটে যাচ্ছে। মুখে কারণে-অকারণে হাসি, বাড়তি উচ্ছ্বাস। আরশি ভাবত তার জীবনেও এরকম একটা সময় আসবে। ঝিরিঝিরি বৃষ্টিপাতের মতো কোনও একজনের প্রতি ভাল লাগায় ভরে যাবে তার মন। তেমনটা হল না। মোটর সাইকেলের বেগে তার জীবনে এসে পড়ল শৌর্য। ভাল লাগা বা ভালবাসার জন্য কোনও বিলাসী সময় পেল না আরশি। শৌর্যর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল। এখন আর কাছছাড়া করতে চায় না। সেই জন্যেই কোনও চান্স নেয়নি। শৌর্যর সঙ্গে চলে এসেছে মহুলিয়ায়। নবমীকে এতটা পথ উপহার দেওয়ার কোনও মানে হয় না। কোথা থেকে কী হয়ে যায়! দেখা গেল, তারপর শৌর্য আর আরশির দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না!

কিন্তু শৌর্যই বা আরশির জন্য কেন এত করছে? ভাল মনের মানুষ বলে? দুঃখী মেয়েটাকে সাহায্য করা উচিত মনে করে? ওর মাঝে কি এতটুকু ভালবাসা জন্মায়নি? কে জানে!

কারণ যাই হোক, মহুলিয়া আসাটা সার্থক হয়েছে আরশির। প্রকৃতির এই রূপ তার অদেখা ছিল। জলপাইগুড়ির আশপাশে অনেক জায়গায় বেড়াতে গিয়েছে। সেখানের প্রকৃতি সজল, গাছপালায় ভরা আর এখানে চারপাশ রুক্ষ, রাঙা ধুলো, এলোপাথাড়ি হাওয়া আকাশের ঢাল অবধি চলে যায় দৃষ্টি, অদ্ভুত উদার-উদাত্ত এক সৌন্দর্য। মন খারাপ স্থায়ী হতে পারে না। মহুলিয়ায় ঢোকার পর আরশি দেখেছে তকতকে সাঁওতালি পল্লী, মাটির বাড়িগুলোর দেওয়ালে আলপনা। পুকুর খুব একটা চোখে পড়ল না। বিশাল-বিশাল ইঁদারা বেশ ক'টা। যার একটার পারে উঠে কপিকলের দড়ি টেনে জল তুলছে সাঁওতালি কিশোরী। আরশি শৌর্যকে বলেছিল, "দ্যাখো, কী রিস্ক নিয়ে জল তুলছে মেয়েটা!"

শৌর্য বলেছিল, "ওরা এতেই অভ্যস্ত। ঝুঁকি বলে মনেই করে না।"

বাইক যখন ইঁদারাটা ক্রস করছে, বাচ্চা মেয়েটা এক হাতে বালতির দড়ি ধরে অন্য হাত দিয়ে আরশিদের টা টা করেছিল।

এ বাড়িতে যখন এসে পৌঁছল আরশিরা, বাড়ির লোকরা এমন আনন্দে আপ্যায়ন করেছিল যেন, শৌর্য ওদের কতদিনের চেনা! মাত্র একটা বেলা এখানে কাটিয়েছে শৌর্য, সেই গল্পটা আরশিকে বলেছে আজ এখানে আসার পথে। ফেরার সময় হাতির পথ আটকানোটাও। আরশিকেও কত তাড়াতাড়ি আপন করে নিল এরা, যেন আরশির আসার কথা ছিলই।

চন্দ্রাবউদি, মলয়দা কেউই রাজি হলেন না শৌর্যর প্রস্তাবে। তাদের মতো এ বাড়িটা সারানো হয়েছে বড় যত্ন করে। শাবল-গাঁইতি দিয়ে ভাঙতে গেলে আঘাত লাগবে বাড়ির চার সদস্যের শরীরে। বাড়িও তো পরিবারেরই একজন।

এরকম সেন্টিমেন্টাল স্ট্যান্ডের বিরুদ্ধে কোনও যুক্তি খাটে না। শৌর্য তাই আর বোঝাতে যায়নি। দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর মলয়দা শৌর্যকে নিয়ে বেরল অন্য বাড়ি দেখাতে। সে বাড়ি অনেক দূরে। মলয়দার বাইকে গিয়েছে শৌর্য। বিকেল না ফুরনো অবধি ফিরবে না। আলো থাকবে ফোটো তোলার। এদিকে বিকেল যে শেষ হতেই চাইছে না। আজ যখন অন্য বাড়ি দেখার সিদ্ধান্ত হল, আরশি বলেছিল, "আমিও যাব।"

শৌর্য বলল, "তুমি গেল বাড়তি কী উপকারটা হবে শুনি? খামোকা দু'টো বাইক বের করতে হবে। আমরা তো আর বেড়াতে যাচ্ছি না, কাজে যাচ্ছি। আসার পথে যা-যা দেখেছ, আমাদের সঙ্গে গেলে তাই দেখবে।"

আরশি বলে ফেলতে যাচ্ছিল, 'আমি তোমার সঙ্গটাই চাই!' সামনে মলয়দা-বউদি ছিল বলে গিলে নিতে হয়েছিল কথাটা। চন্দ্রাবউদি বলে উঠেছিল, "কী দরকার রোদে-রোদে ঘোরার। তার চেয়ে ভাল, খাওয়াদাওয়ার পর ফ্যানের তলায় শুয়ে আমি তুমি গল্প করব।"

গরম তেমন না থাকলেও, বাইরে তখন চোখ-ধাঁধানো রোদ। তার আগে অনেকটা পথ রোদ মাথায় করেই এ বাড়িতে এসে পৌঁছেছিল আরশিরা। বউদি এমনভাবে থেকে যেতে বলল, যেন

ছায়াতলার আস্তানা। থেকেই গেল আরশি। বাচ্চা দুটোকে উপরের ঘরে শুইয়ে, বউদি এল একতলায় আরশির পাশে শুতে। অনেক গল্প হল চন্দ্রাবউদির সঙ্গে। মায়ের ব্যাপারটাও বলে ফেলল আরশি। সদ্য পরিচিতের কাছে এত ব্যক্তিগত কথা না বলাই উচিত। এদের আন্তরিকতা আর শান্ত পরিবেশের কারণেই বোধ হয় মুখে চলে এল সব। মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিল বউদি, "চিন্তা কোরো না। আজ না হয় কাল মাকে ঠিক পেয়ে যাবে। শৌর্যর মতো ছেলের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াটাই তার ইঙ্গিত। উপরওয়ালার ইচ্ছেতেই কাছাকাছি এসে পড়েছ তোমরা।"

কখন যেন একটু চোখ লেগে গিয়েছিল আরশির। ঘুম যখন ভাঙল, পাশে বউদি নেই। উঠোন থেকে ভেসে আসছিল স্বর্ণতোয়ার হাসি। বিছানা থেকে নেমে আরশি ঘরের বাইরে এসে দেখে বউদি রান্নাঘরে রান্না চাপিয়েছে। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আরশি জিজ্ঞেস করেছিল, "কী ব্যাপার! এত তাড়াতাড়ি রান্না বসিয়ে দিলে? আয়োজন দেখে তো রাতের রান্না বলেই মনে হচ্ছে।"

"হ্যাঁ, রাতেরই... তাড়াতাড়ি করার কারণ আছে, পরে বলছি," বলেছিল বউদি। কে জানে, কী কারণ! আরশি গিয়েছিল উঠোনে। ছাগলছানার সঙ্গে খেলছিল মেয়েটা। ছেলেটাকে আশপাশে দেখা যাচ্ছিল না। আরশি জিজ্ঞেস করেছিল, "তোর দাদা কোথায় রে?"

"জানি না!" আরশির দিকে না তাকিয়ে উত্তর দিয়েছিল তোয়া। এতই মত্ত খেলায়, তাকানোর ফুরসত নেই। তৃণীরটার জন্য চিন্তা হচ্ছিল আরশির। কোথায় গেল ছেলেটা? খুঁজে দেখবে কি? তারপর ভাবল, না, থাক। এখানে হয়তো এটাই স্বাভাবিক, বেড়াহীন শৈশব। ভয়ের যদি কিছু থাকত, ছেলে-মেয়ের খোঁজ করত বউদি। সে তো নিজের মনে রান্না করে যাচ্ছে। শহরের মায়েরা এত নিশ্চিন্ত হতে পারে না। চোখের আড়াল হতে দেয় না ছেলে-মেয়েকে। তোয়া খেলে যাচ্ছে। আরশির কিছুই করার নেই। তোয়াকে বলেছিল, "অনেক খেলেছিস। চল, তোকে পড়াই। তোর খাতা বইগুলো দেখি।"

ও মা, চট করে রাজি হয়ে গেল মেয়েটা। বলল, "পড়াবে? চলো।"

ধুলোহাত ঝাড়তে-ঝাড়তে এগিয়ে এসেছিল তোয়া। কোনও বাচ্চাকে এত সোৎসাহে পড়তে আসতে দেখেনি আরশি। নিজে হলেও আসত না। বিছানায় বসে তোয়াকে যখন পড়াতে শুরু করেছিল আরশি, দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল তৃণীর। আরশি বলল, "যা, তুইও বইখাতা নিয়ে আয়।"

তৃণীর দাঁড়িয়েই রইল। চন্দ্রাবউদি রান্নাঘর থেকে বলেছিল, "যা না, আন্টির কাছে হোমওয়ার্কগুলো করে নে।"

সেই যে পালাল তৃণীর, আর আসেনি। বউদি একবার ঘরে এল। বলল, "ছেলেটা বসেনি তো? ওটা এরকমই, লাজুক। বোধহয় দোতলার ঘরে পড়ছে।"

"আন্টি, হয়ে গিয়েছে অঙ্কটা।"

তোয়ার ডাকে অন্যমনস্কতা কাটল আরশির। জানলা থেকে মুখ ফিরিয়ে তোয়ার খাতাটা নিল। চোখ লাগাচ্ছে, ঘরে দু'কাপ চা নিয়ে ঢুকল বউদি। বলল, "চা খাও তো?"

"খাই, তবে নেশা নেই," বলল আরশি। বউদির হাত থেকে চায়ের কাপ নিয়ে তোয়াকে বলে, "একদম ঠিক হয়েছে অঙ্কটা। তুই তো দারুণ ইন্টেলিজেন্ট মেয়ে!"

লজ্জা পাওয়ার হাসি হাসছে তোয়া। শহরের বাচ্চা হলে এতক্ষণে 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে দিত। বউদি তোয়াকে বলে, "যা, এবার। দাদার কাছে গিয়ে পড়তে বোস।"

বইখাতা গোছাচ্ছে তোয়া। আরশি চায়ে চুমুক দেয়। একটা কথা বললে অদ্ভুত শোনাবে, তবু বলতে উছলে পড়ছে বউদিকে। তোয়া ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর বলেই ফেলে, "বউদি, আমি যদি তোমার বাচ্চা দুটোকে পড়াই, এই বাড়িতে থাকি, আমার খাওয়াপরা দিতে পারবে না?"

"ধুর পাগলি, না পড়ালেও খাওয়াপরা দিতে পারব, তবে শৌর্যকেও সঙ্গে রাখতে চাইলে পারব না! তোমার দাদার অত মাইনে নয়!" বলে হাসতে থাকে চন্দ্রাবউদি। আরশিও যোগ দেয় হাসিতে, কাপ থেকে চা চলকে পড়ে কোলে। হঠাৎ করে হাসি থামিয়ে চন্দ্রাবউদি বলে ওঠে, "তুমি একদিনেই জায়গাটাকে এত ভালবেসে ফেললে, আর আমি ঘাটশিলায় থাকতে তোমার দাদার সঙ্গে রোজ ঝগড়া করেছি। বলেছি, অত ফাঁকা নির্জন জায়গায় আমি থাকতে পারব না, তুমি মিছিমিছি বাড়িটা কিনছ। তোমার দাদা কথা শোনেনি। কিনে ফেলল বাড়িটা। বাড়ির কাগজপত্র আমার হাতে দিয়ে বলেছিল, 'ওখানে থাকতে-থাকতে দেখবে ঠিক অভ্যেস হয়ে যাবে, ওখানে কি মানুষ থাকে না? একান্ত যদি না থাকতে চাও, তোমাকে তো কাগজপত্রগুলো দিলাম, ছিঁড়ে ফেলে দাও!' তোমার মলয়দা অত বড়লোক নয় যে, ছিঁড়ে ফেলব ওর কষ্টের টাকায় কেনা বাড়ির দলিল। রেখে দিলাম আলমারিতে।" থেমে চায়ে চুমুক দিল বউদি। আরশি বলল, "তারপর?"

"ঘাটশিলার বাড়ি বিক্রির জন্য লোক খুঁজতে লাগল। পাওয়া গেল তাড়াতাড়ি। ওদের সঙ্গে শর্ত হল, টাকা নেওয়ার দু'মাস পর বাড়ি ছাড়ব আমরা। আসলে ওই টাকাতে এই বাড়িটা রেনোভেশন হবে। শর্তে রাজি হল ওরা। দিনের পর দিন অফিস কামাই করে এই বাড়িটা মিস্ত্রিদের দিয়ে সারাই করাল মলয়। আমরা থাকতে চলে এলাম। মাসদুয়েক যেতে না-যেতে এমন ভাল লেগে গেল জায়গাটা, আমি এখন দু'-চার দিনের বেশি থাকতে পারি না বাপের বাড়ি বা অন্য কোথাও। এত আওয়াজ সেখানে, মাথা ভারী হয়ে আসে। আমার ছেলে-মেয়ে দুটোও বাইরে বেশিদিন থাকতে চায় না!" বলে থামল চন্দ্রাবউদি। ফের কাপে চুমুক দিয়ে মিটিমিটি হেসে বলল, "আজ রাতে তোমাকে নিয়ে একটা জায়গায় যাব।"

"কোথায়?"

"খুব দূরে নয়। এক কিলোমিটার মতো হাঁটতে হবে, খালি পায়ে।"

"খালি পায়ে কেন?"

"পুজো দিতে যাব তো, সেইজন্য। তাই তো রান্নাবান্না আগে থাকতে সেরে নিলাম।"

"কী পুজো গো?"

"কুরঙ্গ পূর্ণিমা।"

"এরকম পুজোর নাম শুনিনি তো কখনও! কোন দেবতার পুজো?"

"যখন যার, তখন বলব কোন দেবতার পুজো। মেয়েরাই কেন শুধু পুজোটা করে। করলে, কী পায়।"

"শুধু মেয়েরাই পুজোটা করে? অনেকটা ব্রতপুজোর মতো?"

আরশির প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় না চন্দ্রার। বাতাসে কান পেতে বলে, "ওই, ওরা ফিরছে।"

জানলার দিকে মুখ ফেরায় আরশি, কই, কেউ তো ফিরছে না। বাইকের আওয়াজও পাচ্ছে না সে। চন্দ্রাবউদি ঠাট্টা করছে না তো? আরশি একজনের প্রতীক্ষায় অস্থির, তাই হয়তো খেপাচ্ছে।

বউদি হাসছে কিনা দেখতে যাবে আরশি, কানে আসে বাইকের গুড়গুড় আওয়াজ। বউদির কান কী শার্প! নাকি আরশিই ক্রমশ বধির হয়ে পড়ছে শহরে বসবাস করে। জলপাইগুড়িতেও এখন প্রচুর আওয়াজ... ওই তো দেখা যাচ্ছ ওদের। বাইকটা এগিয়ে আসছে।

ঘরে ঢুকেই শৌর্য বলল, "আরশি, সরি। তোমাকে না নিয়ে যাওয়াটা ভুল হয়েছে। কী দারুণ স্পট ভাবতে পারবে না। ওদিকে জঙ্গল, টিলা সব আছে। কী অসাধারণ সানসেট হল! ফোটোগুলো দেখো।"

রাগে মাথা গরম হয়ে গিয়েছে আরশির। চন্দ্রাবউদি বলে ওঠে, "জঙ্গল তো আমাদের বাড়ির পিছনেও আছে। এক কিলোমিটার দূরে। রাত নামলে আরশিকে নিয়ে যাব।"

"আমিও যাব!" বলল শৌর্য।

বউদি বলল, "আজ সন্ধে থেকেই ছেলেদের ওই দিকে যাওয়া বারণ।"

"কেন বারণ?" অবাক হয়ে জানতে চায় শৌর্য।

বউদি বলে, "বলা যাবে না।"

উত্তরের জন্য মলয়দার দিকে তাকায় শৌর্য। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল মলয়দা। আশ্চর্য ব্যাপার! এ বিষয়ে কিছু বলাও বারণ নাকি পুরুষদের?

"'কুরঙ্গ' মানে হচ্ছে হরিণ, পুজোটাকে হরিণ পূর্ণিমাও বলতে পার!" বলল চন্দ্রা বউদি।

আরশির মাথায় এখনও কিছু ঢুকছে না। বউদির সঙ্গে-সঙ্গে পুজো দিতে বেরিয়ে পড়েছে। খালি পা তো বটেই, শাড়িও পরেছে আরশি। বউদির শাড়ি। হাতে তালুর মধ্যে ধরে যায় এমন একটা মাটির সরা। তাতে ফুল মিষ্টি। আকাশে বড় চাঁদ, রাস্তা দেখতে অসুবিধে হচ্ছে না। আরশিদের সামনে পিছনে প্রচুর মেয়ে হাতে সরা নিয়ে চলেছে পুজো দিতে। সত্যিই তো, একটাও পুরুষ মানুষ চোখে পড়ছে না! আরশি জানতে চায়, "এটা শুধু মেয়েদের পুজো কেন?"

"তা হলে গোড়া থেকেই ব্যাপারটা বলি। আমরা এখন যে জঙ্গলের দিকে যাচ্ছি, তার সামনে একটা সরোবর আছে। কুরঙ্গ সরোবর। জলে দেখা যাবে নিটোল চাঁদ। দোল পূর্ণিমার আগের রাত তো, তাই। পিছনের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসবে শরীরে আলো পিছলোনো একটা হরিণ। হাজার-হাজার বছর ধরে হরিণটা আসছে। সেই রামায়ণের সময় থেকে।"

"ধ্যাত, বাজে কথা বোলো না তো। হরিণের অত আয়ু হয় নাকি! তাছাড়া রামায়ণের সময় বলে কিছু ছিল কি না, তা নিয়েও অনেকের মনে সন্দেহ আছে।"

"তা হলে হয়তো পাঁচ-দশ বছর অন্তর নতুন হরিণ আসছে। এখানকার আদিবাসীরা বিশ্বাস করে ওটাই। বহু-বহু বছর ধরে ওই একটাই হরিণ আসছে।"

"তারপর কী হবে?"

"পাড়ে নেমে সোনারংয়ের হরিণ জল খাবে সরোবরের। জলে পড়ে থাকা চাঁদের গোল ছায়া ভেঙে যাবে। আমরা যারা এ পারে থাকব, কোনও শব্দ করব না। এতটাই নিঃশব্দ, যে হরিণের জল খাওয়ার আওয়াজটা কানে আসে। আবার জঙ্গলে ফিরে যাবে হরিণ। রাজ হরিণ বা হরিণ ঠাকুর। যে, যেমন মনে করে।"

"তারপর আমরা কী করব? হাতের সরায় ফুল-মিষ্টির কী হবে?"

"ফুল-মিষ্টি ভাসিয়ে দেব সরোবরে। সরায় ভরে নেব জল। ফিরে আসব।"

"সেই জলটা নিয়ে কী করব?"

"সেটা পরে বলছি।"

দূরে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে শাড়িপরিহিতা মহিলারা। ওখানেই নিশ্চয়ই সরোবর। চন্দ্রাবউদি বলল, "তাড়াতাড়ি পা চালাও। আমরা বোধ হয় দেরি করে ফেললাম।"

সরোবরের পাড়ে পৌঁছে গেল আরশিরা। সরোবর ঠিক বলা যায় না, বড় পুকুর, হয়তো কোনও এক সময় সরোবর ছিল। জলে পড়ে রয়েছে পূর্ণিমার আগের দিনের চাঁদ। মৃদু হাওয়া বইছে। তাতে খুব মিষ্টি একটা গন্ধ। নেশা ধরে যাওয়ার মতো। পাড়ে একে-একে উবু হয়ে বসে পড়ছে মেয়েরা। আরশি চাপা গলায় চন্দ্রাকে বলে, "কী সুন্দর একটা গন্ধ পাচ্ছি, কীসের গন্ধ গো?"

"মৃগরাজ কাছে চলে এসেছে, তার নাভির গন্ধ!" বলার পর ফিচ করে হাসে চন্দ্রা। বলে, "এটা আসলে মহুয়া ফুলের গন্ধ। ওই জঙ্গল থেকে আসছে। সকলেই জানে সেটা। কস্তুরীর গন্ধ মনে করতে ভালবাসে।"

বেশ খানিকটা সময় কেটে যায়। ও পারের জঙ্গল থেকে ভেসে আসছে অচেনা সব শব্দ। কিছুক্ষণ আগেও আশপাশে ফিসফিস করে কথা বলছিল মেয়েরা। হঠাৎ সকলেই চুপ। যেন এখনই কিছু ঘটতে চলেছে। জঙ্গলের দিকে ঠায় তাকিয়ে থাকে আরশি। চাঁদের আলো একটু যেন কমে এল। আকাশের দিকে মুখ তুলল আরশি, না, চাঁদ আগের মতোই উজ্জ্বল। আবার চাপা গুঞ্জন, চোখ নামাল আরশি, দেখে চাঁদের ছায়া ভেঙে গিয়েছে। মেয়েরা ফুল-মিষ্টি ভাসিয়ে দিচ্ছে জলে। চন্দ্রাবউদিও ভাসাতে যাচ্ছে ফুল-মিষ্টি, আরশি বলে ওঠে, "কী হল, হরিণ তো এল না!"

"এই তো এসে জল খেয়ে গেল! তুমি খেয়াল করোনি... ভাসিয়ে দাও ফুল, জল ভরে নাও সরায়," বলল চন্দ্রাবউদি।

চাঁদের মায়া আলোয় কোনও ভ্রম হয়েছে এদের। কেন যেন ভ্রমটাকেই মানতে ইচ্ছে করছে আরশির! আক্ষেপ হচ্ছে, মৃগরাজকে একটুর জন্য দেখা হল না!

বাড়ি ফিরছে আরশিরা, সরোবর ছেড়ে অনেকটাই এগিয়ে এসেছে। চন্দ্রাবউদি বলল, "হরিণ মোটেই আসে না। সকলেই কল্পনা করে নেয়। কোনও এককালে হয়তো আসত।"

"সে না হয় বুঝলাম, এবার বলো সরার জলটা নিয়ে কী করব?" নিজের সরার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল আরশি।

বউদি বলে, "জলটা যে যার পুরুষমানুষের গায়ে-মাথায় ছিটিয়ে দেবে। যাতে তার পুরুষটি তাকেই সারাজীবন ধরে ভালবাসে, অন্য কোনও মেয়েকে নয়।"

"দারুণ ব্যাপার তো! এটা তো অসাধারণ পুজো!" ডগমগ গলায় বলে ওঠে আরশি।

ফের চন্দ্রাবউদি বলে, "পুরুষটি কিন্তু একবারও জিজ্ঞেস করবে না, কেন গায়ে জল ছিটোলে, কীসের জল? জিজ্ঞেস করলেই জলের সমস্ত গুণ নষ্ট। পুরুষরা এই পুজো নিয়ে একটা কথাও বলে না। যেন কুরঙ্গ পূর্ণিমা বলে কোনও পুজোর নামই শোনেনি। অথচ নিজের মহিলাটির জন্য রাত জেগে বসে থাকে। মাথা পেতে জলের ছিটে নেয়। ওরা সবই জানে, হরিণ যে আসে না, সেটাও।"

খিলখিল করে হেসে ওঠে আরশি। চন্দ্রাবউদি বলে, "সামলে,

সরার জল পড়ে যাবে।"

আরও খানিকটা এগিয়ে যাওয়ার পর কিছু যেন মনে পড়ে বউদির। বলে ওঠে, "আর হ্যাঁ, জলের ছিটে দেওয়ার পর সরাটা কিন্তু গোড়ালি দিয়ে ভেঙে দিয়ো।"

"কেন?" জানতে চায় আরশি।

হাসতে থাকে বউদি। বলে, "সরায় যদি একফোঁটাও কুরঙ্গ সরোবরের জল থাকে এবং অন্য কোনও মেয়ে সেটা চুরি করে ছিটিয়ে দেয় পুজারিণীর প্রিয় পুরুষটির গায়ে, হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে পুরুষটি। কোনও চান্স রাখবে না বলেই ভেঙে দেয় সরা।"

আবারও হাসি উপচে আসে আরশির মুখে, কোনও রকমে নিজেকে সামাল দেয়। সরার জল ফেলা চলবে না।

বাড়ির কাছে এসে আশ্চর্য হয় আরশি, মলয়দা তো বটেই, তার পুরুষটিও এখনও জেগে! দু'জনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে দোরগোড়ায়। আরশিরা পৌঁছে দরজার সামনে। মাথা পেতে দেয় মলদা। চন্দ্রাবউদি সরার জল ছিটিয়ে দেয় তার পুরুষটির গায়ে। সরা মাটিতে ফেলে গোড়ালি দিয়ে গুঁড়িয়ে দেয়।

মলয়দাকে নিয়ে ঢুকে যায় ঘরে। গোটা কাণ্ডটা অবাক দৃষ্টিতে দেখল শৌর্য। কিছুই বুঝতে পারছে না সে। আরশি দাঁড়ায় তার প্রিয় পুরুষটির সামনে। চাঁদের আলো পিছলে যাচ্ছে পুরুষটির গা থেকে। কুরঙ্গপূর্ণিমার জল ছিটিয়ে দেয় আরশি। সরা ফেলে দেয় মাটিতে। শৌর্য জানতে চায়, "কী ব্যাপার বলো তো? কীসের জল..."

আর কিছু বলতে দেয় না আরশি, নিজের ঠোঁট দিয়ে শৌর্যর ঠোঁট বন্ধ করে দেয়। বলতে দিলেই সমস্ত গুণ নষ্ট। ওই অবস্থাতেই আরশি গোড়ালির চাপে ভেঙে দেয় সরা।

● ১০ ●

শৌর্যরা কলকাতায় ফিরে এসেছে। নবকৃষ্ণদার ফোন এসেছিল মহুলিয়াতেই। বললেন, "বিরাট খবর। বেঁচে আছে রায়া সেন। তবে টাকাপয়সার অবস্থা খুবই খারাপ। হেরোইনের নেশাটাও ছাড়তে পারেনি। যে দোকান থেকে কিনতে আসে পুরিয়া, ঠিকানা জোগাড় করেছি।"

ফোন কানে নিয়ে উত্তেজনায় তখন কাঁপছিল শৌর্য। বলেছিল, "বলুন ঠিকানাটা..."

"ডেঞ্জারাস এলাকা! বেলেঘাটা খালের ধারে একটা গুমটি দোকান, দিনে চা, বিড়ি-সিগারেট বিক্রি হয়, ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যায় সন্ধে নামলেই। তখন হেরোইনের কাস্টমাররা আসতে থাকে," বলে থেমেছিলেন নবকৃষ্ণদা। শৌর্যর পাশে তখন আরশি দাঁড়িয়েছিল। কে ফোন করেছে, জানে। কলটা ধরার আগে শৌর্যই বলেছিল, নবকৃষ্ণদার ফোন। যেহেতু ফোনের কথা শুনতে পাচ্ছিল না আরশি, অধৈর্যের প্রকাশ ঘটাচ্ছিল শৌর্যর কনুইয়ে, খামচে ধরেছিল। একটু ভেবে নিয়ে শৌর্য বলে, "রায়া সেন কবে কখন আসেন দোকানে, সে খবর পেয়েছেন? সেটা না জানলে তো আমরা ধরতেই পারব না তাকে।"

"না, অত নির্দিষ্ট কিছু খবর পাইনি। পাওয়া যাবেও না মনে হয়। মাল যখন ফুরোবে তখনই আসবে কিনতে। কখন ফুরোবে মাল, আগে থেকে কি বলা যায়? আর তোমরাও দিনের পর দিন সন্ধে থেকে রাত আবধি ওখানে গিয়ে বসে থাকতে পারবে না। এলাকার লোকের সন্দেহ হবে। প্রশ্নের মুখে পড়বে তোমরা। লোকগুলো তেমন সুবিধের নয়। জায়গাটা অ্যান্টিসোশ্যালে ভর্তি।"

নবকৃষ্ণদার কথার পিঠে শৌর্য বলেছিল, "ভয় না দেখিয়ে উপায়টা বলুন, রায়া সেনকে কী ভাবে ধরা যায়। আর এই খবরটা আপনাকে দিল কে? সে কোন সোর্সে জানাল রায়া সেন ওই দোকানে পুরিয়া কেনেন?"

নবকৃষ্ণ বলেছিলেন, "সে আমার মতোই মেকআপ আর্টিস্ট। ইন্ডাস্ট্রির পুরনো লোক। ও যে পাতাখোর, স্টুডিয়োপাড়ার কেউ জানত না। আমি রায়া সেনের খোঁজ নিচ্ছি, কানে গিয়েছে ব্যাটার। নিজেই এল আমার কাছে। বলল, হাজারদুয়েক লাগবে, পাক্কা খবর দেবে রায়া সেনের। বললাম, খবর সঠিক হলে তবেই টাকা পাবি। তখন বলল গুমটিটার কথা। নিজে একদিন পুরিয়া নিতে গিয়ে দেখতে পেয়েছে রায় সেনকে। চেহারা দেখে প্রথমটা চিনতে পারেনি। মনে হবে যেন ঝুপড়িবাসী। কিন্তু ও-ও তো মেকআপ আর্টিস্ট। একবার কোনও একটা মুভিতে রায়া সেনের মেকআপ করেছিল। আমি যেমন করিনি। রায়া সেনকে দেখেছি বেশ কয়েকবার। আমার ভুল হলেও, ওর হবে না।"

"তা হলে কী বলছেন, দোকানটায় যাব একবার? জিজ্ঞেস করব রায়া সেনের খবর?" পরামর্শ চেয়েছিল শৌর্য। নবকৃষ্ণদা বললেন, "যেতে পারে। উত্তর পাবে কিনা, বলতে পারছি না। পুরিয়া বিক্রি করার সময় কোনও কথা বলে না ওরা। টাকা নেয় মাল দেয়। ওই দোকানে এখন এক পুরিয়া তিনশো টাকা। সঙ্গে আরও টাকা রেখো। পুরিয়া তো কিনতেই হবে, কথা বলানোর জন্য বাকি টাকা। আবারও বয় দেখাচ্ছি, এলাকাটা কিন্তু সুবিধের নয়। পালানোর রাস্তা খোলা রেখে তবেই গুমটির কাছে যাবে।"

"ঠিক আছে, সে আমি দেখছি... গুমটিটা কী করে চিনব? সেটা বলুন," জানতে চেয়েছিল শৌর্য।

নবকৃষ্ণদা বললেন, "রাস্তার দিকে মুখ করে খালধারে পরপর কয়েকটা গুমটি। একটা-দুটো গুমটি খোলাও থাকতে পারে। সে গুলোতে খোঁজ করার প্রশ্ন নেই। বন্ধ গুমটিগুলোর যেটার ডালা-দরজায় আবছা করে বাংলার চার মানে ইংরেজি আট লেখা থাকবে, সেই ডালায় গুনে-গুনে পাঁচবার চাপড় মারবে। গুমটির সাইডের দরজা খুলে হাত বাড়াবে কেউ। মানে পুরিয়ার টাকা চাইবে। তারপর তুমি কীভাবে বলব নেবে, সেটা তোমার উপর। পুলিশ নিয়ে যেও না। কাজের কাজ হবে না কিছুই। গোটা এলাকায় নজর রাখে ওদের লোক। পুলিশকেও টাকা খাইয়ে রাখে নিশ্চয়ই। এখন ছাড়ছি। কী হল না হল, রেক্সাল্ট জানিয়ো। চিন্তায় থাকব।"

ফোন কেটেছিল নবকৃষ্ণদা। মোবাইল পকেটে রেখে কী কথা হল, আরশিকে জানিয়েছিল শৌর্য। আরশি বলল, "চলো, আজই যাই দোকানটায়।"

শৌর্য বলেছিল, "এখনই দশটা বাজে। মলয়দারা দুপুরের খাবার না খাইয়ে ছাড়বে না। তারপর যদি বেরই, কলকাতায় ঢুকতে সন্ধে। তখনই এতবড় কাজটায় যাওয়া ঠিক হবে না। টানা বাইক চালিয়ে টায়ার্ড থাকব। তার চেয়ে বরং কাল সন্ধেবেলা যাওয়া ভাল। রেস্ট নিয়ে একদম ফ্রেশ মাইন্ডে কাজ করতে পারব।"

শৌর্যর প্রস্তাব মেনে নিয়েছিল আরশি। মলয়দারা বিকেলেও ছাড়তে চাইছিল না। হোলির আগের দিন নাকি ওদের ওখানে হোলিকা রাক্ষুসি পোড়ানো হয়। সেটা কী জিনিস জানে না শৌর্য। জিজ্ঞেস করার মতো মুডও ছিল না। রাবণ পোড়ানোর মতো কিছু

একটা হবে হয়তো।

এবার দোলে রং খেকে বাইরেই থাকল দু'জন। হাইওয়েতে রং ছোড়ার কেউ ছিল না। পায়নি আবিরের গন্ধ। কলকাতায় ফিরে আরশিকে পূর্বাদের বাড়িতে রেখে এসেছিল শৌর্য। আজ বিকেলে ওখান থেকে বাইকে তুলল। সন্ধে নেমে গিয়েছে অনেকক্ষণ। বেলেঘাটা খালধারে এসে পড়ল শৌর্যরা। বিশ্রী একটা গন্ধ। খালের ময়লার। আগে বারকয়েক শৌর্য এই রাস্তা দিয়ে দিনের বেলা বাইক চালিয়ে গিয়েছে। বস্তি অঞ্চল। সাবধানে গাড়ি চালাতে হয়, ছাগল-মুরগি চরে বেড়ায় রাস্তায়। বাচ্চারাও যখন-তখন চলে আসে গাড়ির সামনে। সাইকেল-লরি কেউই ট্রাফিক রুল মানে না। ওই এলাকাই সন্ধেবেলা এমন ফাঁকা হয়ে যায়, আন্দাজ করা যায়নি। ট্রিটলাইট অনেক দূর অন্তর। তাও আবার কয়েকটা জ্বলছে না। পিছনে বসা আরশি বলে ওঠে, "ওই তো গুমটিগুলো।"

চোখ যায় শৌর্যর, ঠিক আন্দাজ করেছে আরশি। কোনও গুমটিই খোলা নেই। গাছের নীচে গুমটিগুলোর সামনে অন্ধকার বেশি জমাট। আরশি গুমটি দেখাতেই, গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করেছিল শৌর্য। এবন বলল, "গাড়ি নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই। এখানেই থাক। তুমি পাহারা দাও, কথা বলে আসছি।"

"না, না। আমিও যাব। তুমি লক করো গাড়ি।"

আরশি যে এ কথাই বলবে জানত শৌর্য, তবু চাইছিল ওকে নিরাপদ দূরত্বে রাখতে। সংখ্যা লেখা গুমটির সামনে পৌঁছে গেল দু'জনে। চাপড় মারার আগে শৌর্য খেয়াল করল তার হার্টবিট বেড়ে গিয়েছে। নিজেকে যথাসম্ভব শান্ত রেখে একদম গুনে-গুনেই পাঁচবার ডালায় চাপড় মারল শৌর্য। খানিক অপেক্ষা পর শৌর্যর যখন মনে হচ্ছে কোনও ভুল হল কি? এই গুমটিই তো? পাঁচবারের কম বেশি মারেনি তো চাপড়? খুলে গেল গুমটির পাশের দরজা। বেরিয়ে এল পুরুষ হাত। খুবই রোগা হাতটা। শৌর্য পাঁচশোর নোট ধরিয়ে দিল হাতে। একটু পরেই বেরিয়ে এল দু'শো ফেরত সমেত একটা পুরিয়া। শৌর্য পুরিয়াটা তুলে নিয়ে বলল, "ওটা থাক, একটা খবর দিতে পারবেন?"

এবার লোকটা মুখ বাড়াল। তোবড়ানো গাল, খোঁচা-খোঁচা দাড়ি-গোঁফ। কলপ উঠে গিয়ে সাদা চুল উঁকি মারছে মাথায়। বলল, "কী খবর জানতে চাও?"

"রায়া সেন কি এখান থেকে পুরিয়া নেন?"

"কে রায়া সেন?"

আরশি বলে ওঠে, "সিনেমায় অভিনয় করতেন। খুব বেশি পরিচিত নয় অবশ্য।"

লোকটা ভিতর থেকে মোবাইল নিল হাতে। বোধ হয় রায়া সেনের ব্যাপারে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু না, কাউকেই কল করল না। বলল, "কোনও সিনেমা আর্টিস্ট এখানে পুরিয়া নিতে আসে না। দেখেই বোঝা যাচ্ছে তোমরা নতুন। নেশাটেশা করো তো, নাকি শুধু খবর নিতে এসেছ?"

"না, না, দু'জনেই নেশা করি, সবে ধরেছি..." বলল শৌর্য। লোকটা জানতে চায়, "এই ঠেকটা কে চেনাল?"

"মানাদা," বলল শৌর্য।

কপালে ভাঁজ ফেলে লোকটা বলে, "কে মানাদা?"

"সে কী, চেনেন না! আপনার রেগুলার খদ্দের। হকার ইউনিয়নের..."

বাকিটা আর বানাতে হয় না শৌর্যকে, মাছি তাড়ানোর মতো লোকটা বলে ওঠে, "যাও তো ভাই। কোনও ফিল্মআর্টিস্ট, মানাফানা কাউকেই আমি চিনি না।"

শৌর্য বোঝে এখান থেকে খবর বেরবে না। অপেক্ষা করে লাভ নেই। আরশির কনুই ধরে টানে শৌর্য। পা বাড়ায়, পিছনে লোকটার গলা পায়, কাকে যেন ফোনে বলছে, "হ্যাঁ, নতুন। একটা ছেলে আর একটা মেয়ে..." খবর দিচ্ছে কাউকে। শৌর্য বোঝে, বত তাড়াতাড়ি সম্ভব এলাকা ছাড়া উচিত।

রাস্তায় উঠে বাইকের দিকে এগোতে যাবে দু'জনে, হাতে লাঠিসোটা নিয়ে ছুটে আসতে দেখে বেশ কিছু ছেলেকে। শৌর্য আরশিকে বলে, "তুমি পালাও। দৌড়ে গিয়ে বাসটাস কিছু ধরে নাও।"

আরশি পালায়নি। চোখের সামনে দেখল ছেলেগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ল শৌর্যর উপর। কোনও প্রশ্ন করছে না। বেধড়ক মেরে যাচ্ছে, লাঠি-রড-লাথি-চড়। মাটিতে পড়ে গিয়েছে শৌর্য। আরশি চিৎকার করছে, "কেন মারছ তোমরা?" মার আটকাতে যাচ্ছে। ওরা ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে আরশিকে। মুখ ঢাকা দিয়ে মার সহ্য করছে শৌর্য। এখনও বলে যাচ্ছে, "আরশি পালাও... পালাও তুমি!"

ফাঁকা রাস্তার দু'দিকে পর্যায়ক্রমে মুখ ঘুরিয়ে আরশি চিৎকার করে যাচ্ছে, "হেল্প! হেল্প! মেরে ফেলবে এরা। বাঁচান। বাঁচান আমাদের প্লিজ..."

আলো-অন্ধকার রাস্তার মাঝে হঠাৎ করে দেখা দিল পাঁচ-ছ'টা মূর্তি। শাড়িপরা অথচ পুরুষকণ্ঠে হুঙ্কার দিতে-দিতে এগিয়ে আসছে, "অ্যাই শালারা, কী হয়েছে রে, সবাই মিলে মারছিস কেন ছেলেটাকে?"

আরশি বুঝতে পারে এরা বৃহন্নলা। কোনও বাড়িতে সন্তান হলে আশীর্বাদ করতে এসে টাকা পায়, বৃহন্নলাদের তেড়ে আসতে দেখে পালাল গুন্ডাগুলো। আরশি ছুটে যায় শৌর্যর কাছে। ঢাকা দিয়েও মুখ অক্ষত রাখতে পারেনি, রক্তে ভেসে যাচ্ছে। আরশি কাঁদতে-কাঁদতে বলে, "আমি তো এখানকার কোনও হাসপাতাল চিনি না। তুমি নবমীর ফোন নম্বরটা কষ্ট করে বলো।"

"কী হয়েছে রে মেয়ে, কেন মারছিল ছেলেটাকে?" বৃহন্নলাদের একজন জিজ্ঞেস করল।

আর একজন অন্যজনকে বলল, "একটা ট্যাক্সি ডাক, হাসপাতাল নিয়ে যেতে হবে।"

শৌর্যকে ঝুঁকে দেখছে একজন। দেখা শেষ করে আরশির হাত ধরে দাঁড় করায়। জানতে চায়, "কেন মারছিল, কী করেছিলি তোরা?"

"মাকে খুঁজতে এসেছিলাম," ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলে আরশি।

"কে তোর মা? তোকে দেখে তো মনে হয়ে না, তোর মা বস্তিতে..."

চোখের পাতা দুটো বাটখারার মতো ভারী লাগছে শৌর্যর, অনেক কষ্টে একটু খুলতে পারে, এক অদ্ভুত দর্শন মহিলা আরশিকে কীসব বোঝাচ্ছে! কার সঙ্গে কথা বলছে আরশি? বেচারি কলকাতার কিছুই চেনে না। আবার কোনও বিপদে পড়তে যাচ্ছে না তো? আরশিকে কথা বলতে মানা করার শক্তি নেই শৌর্যর। চোখ বুজে আসে।

● ১১ ●

প্রায় এক মাস হতে চলল, শৌর্য বিছানায়, এখন বাড়ির। গুন্ডাগুলো অত মারল, তবু হাসপাতালে সাতদিনের বেশি

থাকতে হয়নি। মানুষের শরীর যে কতটা শক্তপোক্ত এটাতেই টের পাওয়া যায়। অজ্ঞান হওয়ার আগে শৌর্যর মনে হয়েছিল, এই বুঝি পৃথিবীকে শেষ দেখা।

বিরাট উপকার করেছে বৃহন্নলার দল। শৌর্যকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল ওরাই। শৌর্যর জ্ঞান ফেরার পর পুলিশ এসেছিল হাসপাতালে। তার খানিক আগেই আরশির সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল শৌর্যর, পুলিশকে আসল ঘটনা বলে লাভ নেই। কেস ঘুরে যাবে রায়া সেনের দিকে। পুলিশ রায়া সেনকে খুঁজতে শুরু করল তিনি আরওই নাগালের বাইরে চলে যাবেন। পুলিশকে বলা হল, বাইক ছিনতাই করতে এসেছিল গুন্ডার দল, ওদের আটকাতে গিয়ে মার খেতে হয়েছে।

হাসপাতালে, বাড়িতে প্রচুর আত্মীয়-পরিজন দেখতে এসেছে হাতে-পায়ে ব্যান্ডেজ করা শৌর্যকে। অনেকে হাসপাতাল বাড়ি দু'জায়গায় বারবার এসেছে। হাসপাতালে থাকার এই একটাই প্লাসপয়েন্ট, বোঝা যায় কত মানুষ ভালবাসে। সুমিতদা হাসপাতালে তো গিয়েছিলই, একদিন বাড়িতে এল ঝুলনদিকে নিয়ে। বলল, "তাড়াতাড়ি সুস্থ হ'। ঝুলনকে বিয়ে করছি। এবার মেয়ে চাপ দিচ্ছে। বিরাট করে পার্টি দেব।"

নবমী এসেছিল হাসপাতালে। কী ভাবে, খবর পেয়েছিল, কে জানে! জিজ্ঞেস করার অবস্থায় ছিল না শৌর্য। নিবেদিতা দেখা করে গিয়েছে বাড়িতে। ওকে নাকি আরশি বলেছে সিরিয়ালে অভিনয় করবে না। নিবেদিতার অ্যাসিস্ট্যান্ট হবে ও। শিখবে প্রোডাকশনের খুঁটিনাটি কাজ। বাড়িতে একদিন নবকৃষ্ণদা এসে হাজির। শৌর্য ভেবেছিল টাকা চাইতে এসেছেন। দেখা গেল তা নয়, শৌর্যকে দেখতেই এসেছেন। ওঁর টাকা মিটিয়ে দিয়ে এসেছে আরশি। নবকৃষ্ণদা এখনও নতুন চশমা কিনে উঠতে পারেননি। শৌর্যর কানের কাছে এসে ফিসফিস করে বলেছিলেন, "এবার বুঝতে পারছ তো, কেন সাবধান করতাম। ঘোলাটে চশমাতেও তোমার চেয়ে আমি ভাল চিনি কলকাতাকে।"

কথাগুলো ফিসফিস করে বলার কারণ, আরশি ওঁকে বলে দিয়েছিল, "শৌর্যকে যদি দেখতে যান, কী কারণে মার খেয়েছে, এই প্রসঙ্গ তুলবেনই না।"

নবকৃষ্ণদা ছাড়া কাউকে বলা হয়নি আসল ঘটনা। বাইক ছিনতাইয়ের গল্পটাই চালানো হয়েছে। পূর্বার বাবাকে সঙ্গে নিয়ে আরশির বাবা দেখা করে গিয়েছেন। পূর্বা নিজেও এসেছিল। একটা ব্যাপারে বেশ আশ্চর্য হয়েছে শৌর্য, সে বাড়ি ফেরার পর আরশি কিন্তু এখানে আস্তানা গাড়েনি। যেটা ওর এতদিনকার আচরণের সঙ্গে মিলল না। তবে ফোনে যোগাযোগ রাখছিল। প্রায় এক সপ্তাহ হতে চলল ওর কোনও ফোন নেই! শৌর্যও করেনি। সবাই এত ফোন করে খবর নিচ্ছে, শৌর্যর ফোন করার অভ্যেসটাই চলে গিয়েছে। যতদিন যাচ্ছে, কমছে শুভানুধ্যায়ীদের ফোন। হাতে-পায়ে প্লাস্টার নিয়ে বেরচ্ছে শৌর্য। ছোটবেলায় বেড়াতে গিয়ে যখন শখের ফোটো তুলত, বাবা উৎসাহ দিত এই বলে, "ফোটো তুলে যা মন দিয়ে। সময় তো দাঁড়ায় না, নিজের মতো বয়ে যায়। ফোটোগ্রাফাররাই পারে পৃথিবীর সুন্দর মুহূর্তগুলোকে ধরে রাখতে।"

আরশিও তো শৌর্যর জীবনে সুন্দর একটা অধ্যায়। তাকে কি হারাতে চলেছে শৌর্য? প্লাস্টার করা হাতেই মোবাইল সেট তুলে নিল শৌর্য। দু'হাতেই প্লাস্টার। কল করে আরশিকে। বেজে গেল ফোন। ধরল না। এরকম তো হওয়ার কথা নয়!

আধঘণ্টা পর আবার ফোন করল আরশিকে। একই রেজাল্ট। কপালে ভাঁজ পড়ল শৌর্যর। এবার কল করল পূর্বাকে। আরশিই নম্বরটা দিয়ে রেখেছিল। বলেছিল, "আমাকে যদি ফোনে না পাও, পূর্বাকে একটা কল কোরো।"

আরশির এখন পূর্বাদের বাড়িতে থাকার কথা। কল রিসিভ করল পূর্বা। বলল, "কেমন আছেন?"

"ভাল," বলার পর শৌর্য জানতে চাইল, "আরশি কোথায় গো? পাচ্ছি না ফোনে..."

"আমাদের বাড়িতে তো আসেনি। কোথাও বেরিয়েছে বুঝি?"

প্রশ্নটা গোলমালের ঠেকছে। শৌর্য জিজ্ঞেস করে, "ও কি এখন তোমাদের বাড়িতে থাকছে না?"

"না। দিনদশেক হল আপনাদের বাড়ি যাচ্ছে বলে বেরিয়ে গিয়েছে। যায়নি বুঝি! মাঝে কিন্তু আমাকে ফোন করেছিল, অন্য কোথাও আছে... এ কথা তো বলল না!"

শৌর্যর টেনশন হতে থাকে, আবার গন্ডগোল শুরু করেছে মেয়েটা। দুশ্চিন্তাটা ছড়াতে না চেয়ে শৌর্য পূর্বাকে বলে, "মনে হচ্ছে নিবেদিতার কাছে উঠেছে। ওর অ্যাসিস্ট্যান্ট হবে বলছিল। দাঁড়াও নিবেদিতাকে ফোন করে দেখি।"

"ওকে, কী খবর হল আমাকে জানাবেন," বলে ফোন রাখল পূর্বা।

নিবেদিতাকে কল করল শৌর্য। তুলল নিবেদিতা বলল, "হ্যাঁ, বলো। আগে বলো কেমন আছ? সলিড বোর করার ইচ্ছ নিশ্চয়ই।"

"তা হচ্ছি। শোনো না, যে কারণে ফোন করেছি, আরশির সঙ্গে যোগাযোগ আছে তোমার?"

"আছে। ফোনে। অনেকদিন দেখা করেনি। কেন বলো তো?"

"না, সেরকম কিছু না। দু'দিন ধরে ওর ফোন আউট অব রিচ, তাই জিজ্ঞেস করছি।"

"চিন্তা কোরো না। ফোন আউট অব রিচ হলেও, ও তোমার রিচের মধ্যেই থাকবে। ব্যাপক ভালবাসে তোমায়," বলে হাসতে-হাসতে ফোন কেটে দিল নিবেদিতা। শৌর্যর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল আরও। আরশি কি বাড়ি ফিরে গেল? ওর বাবাকে একটা ফোন করা যায় কি? করলেও খবরটা ঘুরিয়ে জানতে হবে। রজতবাবুকে কল করল শৌর্য। ছ'টা এখনও বাজেনি। অফিসেই আছেন মনে হচ্ছে। ফোন ধরলেন রজতবাবু, "আরে, তুমি! কোথায় আমি ফোন করে খোঁজ নেব তোমার..."

"সে তো আপনি নেন। আমি ফোন করেছি পূর্বার নম্বরটা নেওয়ার জন্য। আরশিকে ফোনে পাচ্ছি না। পূর্বাকে ফোন করে দেখি কোথায় গিয়েছে!"

"পূর্বাকেও পাও কি না দেখো, দুই বন্ধু খুব ঘুরছে, আরশি তো কালই ফোনে বলেছিল আমাকে! পূর্বার নম্বর এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি... হতে পারে মেট্রোয় আছে দু'জনে!" ফোন কেটে গেল। বুক ধড়াসধড়াস করছে শৌর্যর। আরশির বাবার এসএমএস ঢুকল মোবাইলে। নম্বরটার কোনও দরকার নেই। শৌর্য টের পায় কপালে ঘাম এসে গিয়েছে তার। মেয়েটা কি মাকে খুঁজতে গিয়ে নিজেই নিরুদ্দেশ হয়ে গেল? এতদিন মেয়ের সঙ্গে মাকে খুঁজেছে, এবার কি একা-একাই মেয়েকে খুঁজতে বেরতে হবে! তবু ভাল, ওর ফোনটা এখনও বাজছে। নিজেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে রাখেনি। ফের আরশির নম্বরে কল করে শৌর্য।

● ১২ ●

চন্দ্রাবউদির সঙ্গে হাটে গিয়েছিল আরশি। এইমাত্র ফিরল।

শৌর্য ফোন করেছে, এটা ছ'নম্বর। ফোন প্রাইভেট মোডে রেখেছে আরশি, চন্দ্রাবউদি টের পায়নি। এখন শৌর্যর কলটা ধরল আরশি। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়। বাচ্চা দুটো লেখাপড়া করছে বিছানার উপর। ও প্রান্ত থেকে ভেসে এল রাগ-অভিমান মিশ্রিত শৌর্যের গলা, "কী ব্যাপার, ফোন ধরছ না কেন? টেনশনে আমার মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার জোগাড়। কোথায় আছ এখন?"

"নিরাপদেই আছি।"

"নিরাপদ-টিরাপদ শুনছি না। জায়গায় নাম বলো। তুমি পূর্বাদের বাড়িতে নেই, নিজের বাড়িতেও না, নিবেদিতাও তোমার খবর জানে না। তা হলে আছ কোথায়?"

"মায়ের কাছে, মাকে একটু সুস্থ করে নিই, তারপর তোমার সঙ্গে দেখা করব... কোথায় আছি বলব না! তার চেয়ে বরং নিজে সুস্থ হয়ে আমায় খুঁজে বের কোরো, কেমন?" বলেই ফোন কেটে দিল আরশি। কী মনে করে ফোনসেট অফ করে দিল। আরশি জানে, এই আচরণে তাদের সম্পর্ক মোটেই আলগা হবে না। শৌর্য একমাত্র তারই হয়ে গিয়েছে। সব কথা বলাই যেত শৌর্যকে, মাকে মহুলিয়ায় রাখার ব্যাপারে রাজি হত না। রিহ্যাব সেন্টারে পাঠাতে চাইত। মাকে কাছছাড়া করতে চাইছে না আরশি। কত-কত বছর পর কাছে পেল!

শৌর্য যখন মার খেয়ে পড়েছিল রাস্তায়, তখন সেই বৃহন্নলা মানুষটি খোঁজ দিয়েছিল মায়ের। রায়া সেন নামটা চিনতে পারেনি,

অথচ শোভা নামটা বলতেই বুঝে গেল। বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, শোভা এক সময় সিনেমা করত শুনেছি। সে তো বহু বছর আগের কথা। এখন শিয়ালদা স্টেশনের সামনে পুরিয়া বিক্রি করে।"

"ক'টা নাগাদ, ঠিক কোনখানে গেলে পাব?" জানতে চেয়েছিল আরশি।

বৃহন্নলা বলল, "ওভাবে বলা যায় না। চক্কর কেটে দেখ ক'দিন, ঠিক পেয়ে যাবি।"

সকাল-দুপুর-বিকেল তিনটে আলাদা সময় ধরে তিনদিন মাকে শিয়ালদা স্টেশনের সামনে খুঁজল আরশি। চারদিনের দিন পেল, সন্ধের দিকে। ট্যাক্সিস্ট্যান্ডের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল মা, মায়ের কোনও ছবির সঙ্গে ওই চেহারার মিল নেই। কী করে চিনল আরশি, কে জানে! কাছে গিয়ে 'মা' বলে ডাকতেই, চমকে উঠে ছুটে পালিয়েছিল। মিশে গিয়েছিল ভিড়ে। আরশি পড়ল চিন্তায়। শৌর্য হাসপাতালে, তার একার পক্ষে মাকে উদ্ধার করা মুশকিল বা বলা ভাল অসম্ভব। মনে পড়েছিল প্রেরণা সেন্টারের কথা। ওখানে বললে হয়তো লোক পাঠিয়ে তুলে নিয়ে যাবে। পরমুহূর্তে মনে হয়েছিল, উমেশবাবুর প্রভাব আছে ওই সেন্টারে। ওখানে রাখা ঠিক হবে না মাকে। অগত্যা বাবাকেই ফোন করে বলল সব কথা। বলেছিল, "তুমি চলে এসো, দু'জনে মিলে মাকে নিয়ে যাই বাড়িতে।"

বাবা কিছুতেই রাজি নয়। বলেছে, "শোভা, এখন তোর মা নয়, আমার স্ত্রী-ও নয়। ও এখন অন্য মানুষ। ড্রাগের নেশা মানুষকে বদলে দেয়। ওর কী অবস্থা তুই বুঝতে পারছিস না! ড্রাগ বিক্রি করে ড্রাগের নেশা করতে হচ্ছে। সব চেয়ে বড় কথা, শোভার ওই চেহারা আমি স্ট্যান্ড করতে পারব না। গা বমি-বমি করবে আমার।"

বাবার যখন ঘেন্না হচ্ছে, মাকে সামনে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। ঘৃণা দিয়ে সারিয়ে তোলা যায় না কাউকে। শৌর্য সুস্থ না হওয়া অবধি ওর থেকে পরামর্শও নেওয়া যাচ্ছে না। তখন সে ছিল হাসপাতালে। ওখানেই দেখা হয়ে গেল নবমীর সঙ্গে। শৌর্যকে ফোন করেছিল নবমী, মাসিমার কাছে ছিল ফোন। খবর শুনে দেখা করতে এসেছিল। ওকে দেখে আরশির মনে পড়ল সেই ঘটনা, পেশেন্টকে ডিটক্সিফিকেশন করে প্রেরণা রিহ্যাব সেন্টারে নিয়ে এসেছিল নবমী। ওর কাছে মায়ের ব্যাপারে সাহায্য চাওয়া যেতে পারে। নবমীর কন্ট্যাক্ট নম্বর নিয়েছিল আরশি। পরের দিন ওর হাসপাতালে গিয়ে মায়ের ব্যাপারে সব জানাল। একই সঙ্গে বলে রেখেছিল, "এসব শৌর্যকে জানিয়ো না। ফোন করবে আমাকে। আমি লোক নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স সমেত পৌঁছে যাব।"

নবমী বলেছিল, "আচ্ছা, বলব না। মাকে নিয়েও চিন্তার কোনও কারণ নেই। তুমি শিয়ালদা স্টেশনে গিয়ে লুকিয়ে নজর রাখো মায়ের উপর। যখনই দেখতে পাবে ফোন করবে আমাকে। সব ব্যাপার আমার উপর ছেড়ে দাও। শুধু তোমার মাকে যখন তোলা হবে অ্যাম্বুলেন্সে, একদম কাছেই থেকো। রেল পুলিশকে জবাবদিহি করতে হতে পারে। তুমি যেহেতু ওঁর মেয়ে, মাকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছ। পুলিশ কিছু বলবে না। মনে করে নিজের আইকার্ডটা সঙ্গে রেখো।"

দু'দিন পরেই মাকে পাওয়া গেল একেবারেই প্রতিরোধহীন অবস্থায়। শিয়ালদা স্টেশনের সামনের চাতালে ঘুমোচ্ছিল মা। আরশি যখন এবার শিয়ালদা স্টেশন থেকে পা রেখেছিল কলকাতায়, মা হয়তো ওই ভাবেই ঘুমোচ্ছিল এখানে।

নবমীকে ফোন করে দিয়েছিল আরশি। অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে চলে এল ওরা। মা বাধা দেওয়া বা পালানোর চেষ্টা করেনি। নবমী বলেছিল, "ইনটক্সিকেটেড অবস্থায় আছেন।"

হাসপাতালে থেকে অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠল মা। উইথড্রল সিম্পটম নেই। সমস্যা শুধু একটাই, কথা খুবই কম বলে। আরশির দিকে তাকিয়ে থাকে টানা। চোখের কোন দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে তখন। নবমী বলল, "ওকে কোনও হোমে রাখতে পারো। মাসছয়েকের মধ্যে নর্মাল লাইফে ফিরে যেতে পারবেন বলেই আশা করছি।"

হাসপাতালের বিল মেটাতে অসুবিধে হয়নি আরশির। বাবা ওর অ্যাকাউন্টে নতুন করে বড় অ্যামাউন্টের টাকা দিয়ে রেখেছে। ডেবিট কার্ডে বিল পে করেছে আরশি। মাকে হোমে না রেখে মহুলিয়ায় নিয়ে যাওয়াই মনস্থ করল। আরশিরও ইচ্ছে করছিল এই পরিবেশে মায়ের সঙ্গে থাকতে। অন্য কোথাও, মানে আত্মীয়-

পরিজনের কাছে থাকলে, মায়ের প্রতি করুণা প্রকাশ করত তারা। আরশির সেটা মোটেই ভাল লাগত না। শহরে থাকার একটা ঝুঁকিও আছে, মা পালিয়ে গিয়ে আবার নেশার কবলে পড়তে পারত। মহুলিয়ায় তার কোনও সুযোগ নেই। শহর বহুদূর। মা সেখানে পৌঁছনোর আগেই ধরে ফেলা যাবে। মা হাসপাতালে থাকাকালীন চন্দ্রাবউদিকে ফোন করেছিল আরশি। মাকে ফিরে পাওয়ার ঘটনা জানিয়ে বলেছিল, ''হোমে না রেখে মাকে নিয়ে যদি তোমার ওখানে উঠি খুব অসুবিধে হবে?''

চন্দ্রাবউদি তো রীতিমতো অভিমান করে বসল। বলেছিল, ''তুমি আমাকে একথা বলতে পারলে! তোমার সঙ্গে আমার সেরকম সম্পর্ক!''

সম্পর্ক অথচ মাত্র একদিনের! কলকাতা থেকে গাড়ি ভাড়া করে মাকে এখানে তুলেছে আরশি। মা ধীরে-ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে। শরীর থেকে সরে যাচ্ছে যশ-খ্যাতির গ্রহণ। চন্দ্র-সূর্যেরও তো গ্রহণ হয়। তার থেকে কি তারা বেরিয়ে আসে না? এত পুরনো একটা উদাহরণ হাতের কাছে থাকতে, গ্রহণ লাগা মানুষকে কেন যে তার পরিজনেরা শেষ হয়ে গিয়েছে বলে ধরে নেয়, কে জানে!

''তোমার চা,'' বলে চায়ের কাপ এগিয়ে ধরল বউদি, অন্য হাতে নিজের কাপ।

কাপ হাতে নেওয়ার আগে আরশি বলে,''মাকে একবার দেখে আসি, নাকি? এসে চা খাচ্ছি।''

''আমি দেখে এসেছি। এই মাত্র ওঁকে চা দিয়ে দোতলা থেকে নামলাম। খাচ্ছেন চা। কোনও সমস্যা নেই।''

বউদির থেকে কাপ নিয়ে চায়ে চুমুক দেয় আরশি। বলে, ''খানিক আগে শৌর্য ফোন করেছিল। বলিনি কোথায় আছি। আন্দাজ করে তোমাদের ফোন করতে পারে। বলবে না এখানে আছি। ও না থাকলে মাকে কোনও দিন খুঁজে পেতাম না। ও এখনও পুরো সুস্থ নয়। মায়ের ব্যাপারে আবার ও জড়িয়ে পড়ুক, চাইছি না। খুব খারাপ লেগেছিল, ও যখন হাসপাতালে, আমি ওকে দেখতে যেতেও পারিনি। মাঝে-মাঝে হাসপাতালে ফোন করে খবর নিয়েছি। কিন্তু তারপর মা-কে পেয়ে এক মুহূর্তের জন্যও মাকে চোখের আড়াল করতে সাহস হয়নি! যদি আবার হারিয়ে ফেলি। শৌর্য নিশ্চয়ই আমাকে ভুল বুঝবে না, বলো?''

''ও তো জানেও না তুমি এখন কোথায়... ওর থেকে অত দূরে-দূরে থাকলে, যদি তোমাকে ভুলে যায়?'' কপট ভয় দেখায় চন্দ্রাবউদি।

মিচকি হেসে আরশি বলে, ''একটু খুঁজুক না হয় আমায়! আর ভুলে না যাওয়ার ব্যবস্থা তো তুমি করেই দিয়েছ। কুরঙ্গ পূর্ণিমার জল ছিটিয়ে দিয়েছি মাথায়।''

চা খেয়ে দোতলার ঘরে উঠে এসেছে আরশি। দরজার দিকে মায়ের পিঠ। বিছানার উপর হাঁটুতে থুতনি রেখে বসে আছে মা। সারাক্ষণ কী যে ভাবে একমনে! এ বাড়ির একটা গল্পের বই পড়তে দিয়ে গিয়েছিল আরশি। খুলেও দেখেনি মনে হচ্ছে। বন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে সামনে। চা-টাও পুরো খায়নি। অর্ধেক হয়ে আছে কাপ। কোনও কিছুতেই তেমন উৎসাহ পায় না। ওটাই ফেরাতে হবে। এগিয়ে গিয়ে মায়ের পিঠে হাত রাখে আরশি। মা চমকায় না। ধীরে ঘাড় ফেরায়। অভিমানের গলায় বলে ওঠে, ''কোথায় ছিলি এতক্ষণ?''

উত্তর দেওয়ার আগে থমকায় আরশি। মনে হয় আয়না দেখছে! মায়ের মুখের সঙ্গে তার এত মিল! ছোটবেলায় সবাই বলত সুখী হবে আরশি, যেহেতু সে পিতৃমুখী। আরশির কি কোনও বিভ্রম হচ্ছে? মায়ের মুখে নিজেকে দেখতে পাচ্ছে সে। আরশি মাকে বলে, ''ছাদে যাবে মা? এখানকার আকাশ খুব পরিষ্কার। আমাদের জলপাইগুড়ির মতো। কলকাতার আকাশ বড় ঘোলাটে। ছাদে চলো। দেখবে জলপাইগুড়ি সঙ্গে কী মিল! গিজগিজ করছে তারা, ধবধবে চাঁদ...''

মা প্রস্তুতি নিচ্ছে বিছানা থেকে নামার। আরশির মুখে ছড়িয়ে পড়ে খুশি। কে বলেছে মাতৃমুখী মেয়ে সুখী হয় না?

অন্ধকার সিঁড়ি ধরে ছাদে যাচ্ছে মা-মেয়ে। যেন আরশি আর আয়না। আকাশের চাঁদ-তারারা আজ এদের দিকে ঝুঁকে পড়ে মুখ দেখবে নিজেদের।

ছবি: শুভম দে সরকার